বাঙলাকথা

নজরুল-বিচিত্রা

নজরুল-বিচিত্রা

বাঙলাকথা

নজরুল-বিচিত্রা

মাসিক বাঙলাকথা

রেজি নং ডিএ ঢাকা ৬১০২

অষ্টম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
মে-আগস্ট ২০১৯

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
মো. শরীফ হোসেন

সম্পাদক
রাবেয়া সুলতানা পারু

নির্বাহী সম্পাদক
সমর ইসলাম

প্রতিবেদক
আবুল বাশার
কামরুল ইসলাম
নাইমুল ইসলাম
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
ইমরান হোসেন

সার্বিক যোগাযোগ
স্যুট # ১০০৮/এ, নাহার প্লাজা
হাতিরপুল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৬৭৮০৬০৪৯৫
০১৭০৩২৩২২২৬
e-mail : banglakotha2011@gmail.com
www.banglakothabd.com

দাম : ১৫০ টাকা মাত্র

নজরুল স্টাডি সেন্টারের নিবেদন

নজরুল-বিচিত্রা

সহযোগী সকল ব্যক্তি
ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা

নজরুল স্টাডি সেন্টার
১০০৮-এ নাহার প্লাজা, হাতিরপুল
ঢাকা।
ফেইসবুক :
https://www.facebook.com/groups
/1225632124206211/

সম্পাদক কর্তৃক আনীশা প্রিন্টার্স, ৮/এ কাঁটাবন রোড, নীলক্ষেত, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ২২৬ ফকিরাপুল, (৩য় তলা), ঢাকা থেকে প্রকাশিত

ISBN : 978-984-93068-5-6

নজরুল-বিচিত্রা

মাসিক বাঙলাকথা

সূচিপত্র

সবার কবি নজরুল ৫
মোঃ জেহাদ উদ্দিন
অলকপ্রেমী নজরুল ১৫
পীযুষ কুমার ভট্টাচার্য্য
নজরুল সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ১৮
সৈয়দ আল জাবের
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিক জীবন ২৩
আনোয়ারুল কাইয়ূম কাজল
কাজী নজরুল ইসলাম : মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় ২৯
সুহৃদ সাদিক
নজরুলের গানের প্রজ্ঞাময় ব্যাখ্যা ৩৫
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যাহা নাই নজরুলে, তাহা নাই সঙ্গীতে ৩৯
আনিস রহমান
কাজী নজরুল ইসলামের অভিভাষণ ৪২
নজরুল ও তাঁর সমাজ চিন্তা ৬৫
অধ্যাপিকা রোকেয়া পারভীন

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা

নিত্য প্রবল হও ৬৮
ভয় করিও না, হে মানবাত্মা ৭০
নজরুলকে নিবেদিত কবিতা
মহাবিশ্ব কবি কাজী নজরুল ইসলাম ৭২
-মুহাম্মাদ আবদুল আওয়াল
নজরুল সমাধি ৭৬
মুহাম্মাদ এনাম সিকদার
আজও স্মরি তোমাকে ৭৭
আজও চাই তোমাকে
মোসলেম উদ্দিন সাগর
কবির বীণায় বিনা তারের আলাপন ৭৮
-মোঃ জেহাদ উদ্দিন
সাম্যের নজরুল ৭৯
নাঈম দুর্জয়

সবার কবি নজরুল

মোঃ জেহাদ উদ্দিন

'Nazrul will be found wherever poetry has been used to fight against oppression..... his appeals were general...'

Sampling the poetry of Nazrul: William Race, Nazrul: An Evaluation, Nazrul Institute (2000), page 102

অর্থাৎ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যেখানেই কবিতা ব্যবহৃত হবে, সেখানেই নজরুলকে দেখা যাবে।.....আসলে তাঁর আবেদন সর্বজনীন।

সবার কবি নজরুল। শুধু কবি কেন বলব? সাহিত্যের সর্বত্রই তাঁর অবাধ ঈর্ষণীয় বিচরণ। মাত্র তেইশ বছরের সৃষ্টিশীল (১৯১৯-১৯৪২ খ্রি.) জীবন! এত অল্প সময়ের মধ্যে কতভাবে কতরূপেই না তিনি আবির্ভূত হয়েছেন! কবিতা, সঙ্গীত (গীতিকার, সুরকার,

স্বরলিপিকার, গায়ক, বাদক, সঙ্গীতজ্ঞ), প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, গল্প, অভিভাষণ, পত্রালাপ, জবানবন্দী, আত্মকথা, অনুবাদ সাহিত্য, সমালোচনা সাহিত্য, শিশু সাহিত্য, গীতালেখ্য-গীতিনাট্য রচয়িতা, সাংবাদিক, সম্পাদক, পত্রিকা পরিচালক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র-কাহিনীকার, চলচ্চিত্র-পরিচালক কোনটা রেখে কোনটা বলব? কখনো বিদ্রোহী, কখনো শান্ত-সৌম্য মৌনী-ঋষি, কখনো মাঠে, কখনো জেলে, কখনো প্রেমে কখনো বিরহে, কখনো আনন্দে কখনো বেদনায়-সর্বত্রই নজরুল।

নজরুল 'চির উন্নত শির'। ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই মাত্র ৪৩ বছর বয়সে নজরুল চিরকালের জন্যে নির্বাক হয়ে যান। এর অব্যবহিত পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় কাঁপা কাঁপা হাতে তিনি লিখেছিলেন 'চির-কবি নজরুল'। ইতিহাস প্রমাণ করেছে এবং যত দিন যাবে তা তত বেশি আলোকিত সত্য হিসেবে প্রতিভাত হতে থাকবে যে, নজরুল চির দিনের কবি, চির মানুষের কবি।

মানুষ বলতে নজরুল কি বুঝতেন? মানুষের মর্যাদা কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর নজরুলের জীবন ও কর্মের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। এ পর্যায়ে তাঁর 'মানুষ' কবিতা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি:

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান্!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্ম জাতি
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।-

(মানুষঃ কাজী নজরুল ইসলাম)

সাহিত্যে সর্ব মানুষের এমন জয়গান দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে নজরুলের দ্বারাই। এ ক্ষেত্রে নজরুল অদ্বিতীয়, অতুলনীয়।

নজরুল-কাব্যে সকল শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষের উপস্থিতির কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি। এতে দেখা যাবে যে, সকল মানুষই সমান গুরুত্ব পেয়েছে নজরুলের সাহিত্যে এবং তাঁর জীবনের সামগ্রিক ভাবনায়। শিশুদের জন্যে নজরুল যেমনটি লিখেছেন তেমনটি বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। সহজ-সরল কৌতুকরসে সমৃদ্ধ তাঁর শিশু-সাহিত্য। শিশু মনের সহজাত দুরন্তপনা, ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে রচনাগুলোয়। সাধারণত শিশু সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে উপদেশের আধিক্য যা সাহিত্য না থেকে 'সাহিত্য-ব্যবস্থাপত্রে' রূপান্তরিত হয়ে শিশুদের কচি ঘাড়ে বোঝা হিসেবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু নজরুল শিশু সাহিত্যে জ্ঞান বিতরণ বা উপদেশের ঘনঘটা নেই, নেই অপরিশীলিত বা অমার্জিত ভাবের প্রকাশ। শিশুমনের সম্ভব-অসম্ভব সব ধরণের ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে তাদেরই চির-চেনা ভাষায়, চাপিয়ে দেয়া কিংবা বড়দের ভাষায় নয়। এত

বড় অসম্ভব কাজটি তিনি করতে পেরেছেন তাঁর বিশেষত্বের কারণেই। তিনি যখন যার জন্যে লিখেছেন তখন তারই হয়ে গেছেন, তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ই তাঁকে অমর সব লেখার খোরাক জুগিয়েছে। আর তাঁর শিশুতোষ রচনা শিশুদের একান্ত হবার আরেকটি কারণ এই যে, রচনাগুলোর অধিকাংশই তাঁর কিশোর বয়সের রচনা। ফলে তিনি শিশুদের জন্যে যা লিখেছেন তা রীতিমত তাদের প্লাটফরম থেকেই রচিত। আর এর মাধ্যমেই নজরুলের শিশু সাহিত্য হয়ে উঠেছে একান্তভাবে শিশুদের সম্পদ।

নজরুলের অন্যতম প্রধান শিশুতোষ কবিতা 'ঝিঙেফুল'। শিশুমনের রঙিন ভূবন যেন তাদেরই ভাষায় নব ব্যঞ্জনা পেয়েছে কবিতাটিতে। কাব্য স্রষ্টা নজরুল এখানে অনন্য। তিনি আরও অনন্য এবং অতুলনীয় যখন তিনি লিখেন-

তুমি বল– 'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়,
চাই না ও অলকায়-
ভাল এই পথ-ভুল!
ঝিঙেফুল।।

(ঝিঙেফুল: কাজী নজরুল ইসলাম)

অর্থাৎ একজন শিশু তার কোমল মনের নির্মল আনন্দময় ভুবনে মাটি-মাতা-মানুষকে ভালবাসার খেলাও খেলছে মনের আনন্দেই। আর এভাবে মনের অজান্তেই ভালোবাসার প্রত্যয়যুক্ত একটি পৃথিবী গড়ার পথে এগিয়ে যায় শিশুরা।

শিশুমনের হাজারো জিজ্ঞাসা এবং তার রহস্যময় জগত নজরুল কাব্যে এমন বাঙ্ময় হয়ে ওঠেছে যার দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। খুকি ও কাঠবেরালি, খাঁদু-দাদু, লিচু-চোর, সারস পাখি, নতুন খাবার, মটকু মাইতি বাঁটকুল রায় শিশুদের নির্মল বিনোদনের একেশটি অনবদ্য উপাখ্যান। এমন অনবদ্য বিনোদন-পাখি শিশুকেই আবার তিনি প্রভাতের গান শুনিয়েছেন-

ভোর হোলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠো রে!
ঐ ডাকে
যুঁই-শাখে
ফুল-খুকি ছোটো রে!
খুকুমণি ওঠো রে!

(প্রভাতী: কাজী নজরুল ইসলাম)

হ্যামিলনের এমন বাঁশিওয়ালা যখন ডাকে, তখন দুনিয়ার তাবত শিশুর মধ্যে যেন সাড়া পড়ে যায় একসাথে–

উঠ্‌ল
ছুট্‌ল
ঐ খোকাখুকি সব,
'উঠেছে
আগে কে'
ঐ শোনো কলরব।

(প্রভাতী: কাজী নজরুল ইসলাম)

নজরুলের এই শিশুরা হবে 'সকাল বেলার পাখি', তারা 'সূয্যি মামা জাগার আগে' জেগে উঠবে। প্রচলিত সেকেলে সমাজ যদি তাদের জাগরণের পথে বাধার সৃষ্টি করে তা তারা অতিক্রম করবে; কেননা তাদের মনে এক স্বর্গীয় জিজ্ঞাসা 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?' তারা গাঁয়ের রাখাল হয়ে প্রকৃতির সকল সম্পদ মানবতার জন্যে চষে নিয়ে আসবে, দিনের সহচর হয়ে সকল আঁধার দূর করবে, সাত সাগড় পাড়ি দিয়ে মানব সভ্যতার জন্যে সকল সম্পদ বয়ে নিয়ে আসবে। দুঃখিনী এ জগত-মাতাকে সে কথা দিয়েছে-

'দুঃখিনী তুই, তাই তো মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব-ঢাক্‌ব মা এ লাজ।'

(সাত ভাই চম্পা: কাজী নজরুল ইসলাম)

স্বর্গদূত শিশুদের নজরুল স্বাগত জানিয়েছেন এই বলে-

'পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর!
.....
ছোট তোর মুঠি ভরি' আনিলি মণি
সোনার জিয়ন-কাঠি মায়ার ননী।
তোর সাথে ঘর ভরে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হল, কি জানিস গুণ!'

(শিশু যাদুকর: কাজী নজরুল ইসলাম)

শিশুমনের চিরায়ত জিজ্ঞাসা নজরুলের যাদুর হাতে কাব্য হয়েছে এভাবে-

'রব না চক্ষু বুজি
আমি ভাই দেখব খুঁজি

লুকানো কোথায় কুঁজি
দুনিয়ার আজব-খানার!
আকাশের প্যাঁটরাতে কে
এত সব খেলনা রেখে
খেলে ভাই আড়াল থেকে,
সে তো ভাই ভারী মজার।'

(জিজ্ঞাসা: কাজী নজরুল ইসলাম)

আর তাই তো নজরুল কাব্যে শিশুদের চিরায়ত সংকল্প ভাষা পেয়েছে এভাবে-

'থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।'

(সংকল্প: কাজী নজরুল ইসলাম)

শিশুদের জন্যে নজরুল যখন কাজ করেছেন তখন যেন তিনি নিজেই শিশু হয়ে গেছেন। তাদেরই একজন হয়ে তিনি অমর সব শিশুতোষ সাহিত্য সৃজন করেছেন।

মেয়ে শিশুদের প্রতি অত্যাচার মানব সভ্যতার ইতিহাসে কম হয় নি। আজকের এই চরম উন্নতির যুগেও মেয়ে শিশুরা বিভিন্ন সমাজে চরম বৈষম্যের শিকার হয়। যেমন ভারতের কোন কোন জায়গায় এখনো মেয়ে শিশুর জন্মকে এতটাই নিরুৎসাহিত করা হয় যে, ভ্রুণ পর্যায়েই তাকে হত্যা করা হয়। আর নজরুল মেয়ে শিশুর আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছেন এভাবে-

কও দেখি বোন কোন মেয়ে এই আসলো মোদের আঙিনায়-
এত স্নেহ উছলে পড়ে কাহার তনুর ভঙ্গিমায়?
এ যে মোদের ভারতী মা.....

(মুকুলের উদ্বোধন: কাজী নজরুল ইসলাম)

মেয়েদেরকে 'ঘরের লক্ষ্মী' আখ্যা দিয়ে নজরুল পৃথিবীর স্বর্গ-সুখের যে চিত্রটি এঁকেছেন সেখানে মেয়েদের জীবন নির্মল আনন্দে ভরপুর-

ছোট ছোট বোনগুলি সব আহ্লাদে আজ আটখানা,
কচি হাসির বাঁশি কাঁপায় পুলক দিয়ে মাঠখানা।

(মুকুলের উদ্বোধন: কাজী নজরুল ইসলাম)

শিশুর পর আসে কিশোর। নজরুল কিশোরদের মাঝে নিজেকে খুঁজে ফিরেছেন এভাবে-

ভিড় করে কে আসলি তোরা বাজিয়ে বেণু!
তোদের মাঝে কিশোর আমার দেখতে এনু।।
হারিয়ে গেছি অনেক দূরে
যৌবনের এই রৌদ্র-পুরে;
ধেনু-চরা তোদের সুরে
আমায় আবার ফিরে পেনু।।

(কিশোর-স্বপন: কাজী নজরুল ইসলাম)

নজরুলের কিশোরেরা নতুন যুগের অভিযাত্রী, সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার ও অচলায়তন ভাঙার সৈনিক। কেবল স্কুলে যাওয়া আর চাকরি করা তাদের আদর্শ নয়। তারা দেশমাতার মুক্তিপ্রত্যাশী হিসেবে সম্ভাব্য সকল সংগ্রামের আপোষহীন কর্মী। তাই তো তাদের কণ্ঠে দৃপ্ত উচ্চারণ-

'মা! আমারে সাজিয়ে দে গো বাইরে যাওয়ার দেশে,
রইব না আর আচল-ঢাকা গণ্ডী-আঁকা দেশে।
মা! এখানে নাই যে জীবন প্রাণের আবীর-খেলা,
আপনাকে যে আপনি মোরা হানছি অবহেলা।
'স্কুলে যাও, চাকরি কর'-
আদর্শ নাই ইহার বড়,
সকাল বেলা জেগে ওঠা, ঘুমিয়ে সন্ধ্যাবেলা,
দেশ কোথা মা! এ যে শুধু শ্মশান-শবের মেলা।'

(কিশোর স্বপ্ন: কাজী নজরুল ইসলাম)

শিশুরা বিদ্যাশিক্ষার জন্যে ছাত্রজীবনে প্রবেশ করে। একজন ছাত্রের সাধনা কি হবে তা অসাধারণ কুশলতায় নজরুল এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যার দ্বিতীয় উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যের আছে কি না সন্দেহ। ছাত্রদের জন্যে নজরুল রচিত 'ছাত্রদলের গান' কবিতাটিই এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট। নজরুলের চোখে ছাত্ররা অপরিমেয় শক্তির আধার, বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্যে তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে জানে। আকাশ-পাতাল-মর্ত্য জয় করে তারাই সৃজন করে 'ভালবাসার আশার ভবিষ্যৎ'। তাদের জ্ঞানের মশালে আলোকিত হয় আঁধার পৃথিবী, তাদের চোখেই স্বপ্ন দেখে গোটা পৃথিবী। কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি-

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।

মোদের পায়ের তলায় মুর্ছে তুফান
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড়-বাদল
আমরা ছাত্রদল।।

.....

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্যকালের ডাক।

.....

আমরা রচি ভালবাসার
আশার ভবিষ্যৎ
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায়
আকাশ-ছায়পথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমারা ছাত্রদল।

(ছাত্রদলের গান: কাজী নজরুল ইসলাম)

তরুণ মনের আশা-আকাঙ্খা আর তাদের অপরিমেয় শক্তিমত্তা নজরুল যেমন করে আবিষ্কার করতে পেরেছেন তা সাহিত্যে আর কেউ পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তরুণদের তিনি চিত্রিত করেছেন দুনিয়া বদলের হাতিয়ার হিসেবে। তাদের সেই শক্তির উদ্বোধন তিনি কামনা করেছেন যার মাধ্যমে সকল অন্যায় অনাচার বৈষম্য বানের জোয়ারের মত ভেসে যায়, পৃথিবীজুড়ে জেগে ওঠে সবুজ প্রাণের স্পন্দন। অত্যাচারী শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে তারা দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে-

যখন জালিম ফেরাউন চাহে মুসা ও সত্যে মারিতে ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই;
আজো নম্‌রুদ ইব্রাহিমেরে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী।।

কিংবা

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুত কালো মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে,

মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মত মোরা ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি।।

(তরুণের গান: কাজী নজরুল ইসলাম)

ভয়-ভীতি দূর করে, জরা-জীর্ণতার বিপরীতে আলোকিত পৃথিবী গড়ে দেয় এই তরুণেরা। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় অনবদ্য গান-

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা-জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে',
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী।।

(তরুণের গান: কাজী নজরুল ইসলাম)

তরুণদের আত্মত্যাগের ফলেই রচিত হয় নবযুগ, নবপথ, আসে স্বাধীনতা। তাদের চলার পথ ও তারা হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারা এই তরুণদের চলার পথের চিত্র এবং তাদের মঞ্জিলে মকসুদ নজরুল-কাব্যে উঠে এসেছে এভাবে-

নূতন দিনের নবযাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যায় আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে।
ভবিষ্যতের স্বাধীন পতাকা উড়িবে যেদিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে, ওগো তোমাদের সুখ স্মরি।।

(তরুণের গান: কাজী নজরুল ইসলাম)

নজরুলকে যদি বলা হয় একজন শ্রমজীবি তাতে ভুল বলা হবে না। তিনি শিশু বয়সে বাস্তব প্রয়োজনেই কর্মের পথ বেছে নেন। তাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালে, আর তাঁর পিতা মারা যান ১৯০৮ সালে। শিশু বয়সে পিতাকে হারিয়ে তিনি কেবল এতিম হন নি, তাঁর মা ও ভাই-বোনকে নিয়ে মারাত্মক আর্থিক সংকটে পড়ে যান। কিন্তু অতি স্বাভাবিক ব্যাপার হ'ল, যে মহামানব পরিণত বয়সে সমাজের হাল ধরবেন, সেই মহামানব তাঁর পরিবারের প্রতিও দায়িত্বশীল হবেন-তা যত অল্প বয়সেই হোক না কেন! নজরুল তাই করেছেন। মক্তবে শিক্ষকতা, মসজিদ ও দরগা'র খাদেমগিরি, লেটোদলে যোগদান এবং পরবর্তী সময়ে রুটির দোকানে চাকরি-এত বৈচিত্র্যময় কর্মময়তা দিয়েই কিন্তু এই মহামানবের মহাজীবনের সূচনা। পৃথিবীর কোন্ কবি-সাহিত্যিকের জীবন এমন বৈচিত্র্য এবং বাস্তবতায় ভরা? সম্ভত একজনেরও না!

কর্মময় জীবনের কঠোর বাস্তবতা থেকে নজরুল রস নিংড়ে এনেছেন এবং গোটা মানব সভ্যতার জন্যে তা অকাতরে বিলিয়েছেন। বিশ্বের সকল শ্রমজীবি মানুষ তাঁর কাব্য থেকে

রস ও শক্তি আহেরণ করে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর নিরন্তর প্রেরণা লাভ করে থাকে। তাঁর সর্বহারা, কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, ধীবরদের গান, ফরিয়াদ, কুলি-মজুর কবিতা, অসংখ্য গান, অনেক প্রবন্ধ, অভিভাষণ, সম্পাদকীয় ইত্যাদি মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সম্পদের মধ্যে অগ্রগণ্য যেগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এদিক থেকে নজরুল বিশ্ব মানবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠতম বন্ধু-যে অভিধায় বিশ্বের খুব কম সংখ্যক কবি-সাহিত্যিককে অভিহিত করা যায়।

নজরুল সাম্যের কবি। অন্যভাবে বলতে গেলে পৃথিবীর কোন কবি-সাহিত্যিক তাঁর মতো করে সাম্যের এমন জয়-গান গাইতে পারেন নি। নজরুলকে যদি বিশ্বসমাজ অধিকতর আবিষ্কার, লালন ও ধারণ করতে পারে তবে সাহিত্যের মধুর অস্ত্রে বিশ্ব সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগলাভে ধন্য হবে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সাহিত্য যদি নির্যাতন-নিপীড়িন বন্ধের হাতিয়ার আর সকল মানুষের অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম স্থানে থাকবেন একজন-যিনি বাংলা মায়ের তিলকরত্ন, আমাদের প্রাণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

নজরুল হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি-সকল ধর্মের মানুষের কবি। নজরুল প্রত্যেকের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতিকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। এমন উদারতা এবং সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠত্ব বাংলা সাহিত্যে এবং বিশ্বসাহিত্যে আর কেউ দাবি করার যোগ্যতা রাখেন না।

নজরুলকে নিয়ে যেমন মসজিদে যাওয়া যায়, তেমনি যাওয়া যায় মন্দিওের। এখানেই নজরুলের শ্রেষ্ঠত্ব। নজরুলের খালেদ, উমর ফারুক ইত্যাদির কাছে যেমন 'শিবাজী' নিস্প্রভ, তেমনি তাঁর অসাধারণ মনের অবিনশ্বর সৃষ্টি ইন্দু-প্রয়ান, শরৎচন্দ্র, রবি-হারা, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহনের তিরোধান, বাঙলার মহাত্মা, অশ্বিনীকুমার, সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি, আশু-প্রয়াণ-গীতি, ইন্দ্রপতন ইত্যাদি তাঁকে করেছে মহত্বের মানদন্ডে অতুলনীয়। তিনি যেমন লিখেছেন অসংখ্য ইসলামি সংগীত, তেমনি তিনি অমর-অজর-অব্যয় হয়ে আছেন হিন্দুধর্মীয় অগণিত সংগীতের জন্যে। একজন মুসলিম যেমন তাঁর ধর্মীয় রচনা পড়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন, চোখের পানি সংবরণ সংবরণ করতে পারেন না, একেকজন একেকটি খাঁটি মুসলিমে পরিণত হন, ঠিক তেমনি একজন হিন্দু নজরুলের হিন্দু ধর্মীয় লেখা পড়ে আবেগাপ্লুত না হয়ে পারেন না। এ যেন রীতিমত অবিশ্বাস্য বিষয়। কিন্তু তা কতটা বাস্তব তা নজরুলকে চর্চা না করলে বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না।

শুরুতেই বলেছিলাম নজরুল সবার কবি। তিনি যখন দরিদ্র মানুষের কবি, তখন তিনি দারিদ্র্যের জয়গান গেয়েছেন–

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান

কন্টক-মুকুট শোভা!- দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস;
উদ্ধত উলঙ্গদৃষ্টি; বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার!

(দারিদ্র্য: কাজী নজরুল ইসলাম)

দারিদ্রের এমন বন্দনা এবং দারিদ্রকে জয় করে সামনে এগিয়ে যাবার এমন টনিকরূপ প্রেরণা বিশ্বে ক'জন সাহিত্যিকের সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়? এক্ষেত্রেও নজরুল অনন্য এবং বিশ্বের সকল হত-দরিদ্র মানুষের আশার আলো।

আবার ধনিক-শ্রেণিকে তিনি বারংবার সতর্ক করেছেন যেন তাদের সম্পদ মানবতার কাজে ব্যয়িত হয়। অবৈধ অর্থ আহরণকারীদের তিনি রীতিমতো 'অর্থ-বেশ্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানমুক্ত একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার সাধনা করেছেন তাঁর জীবনের সকল শক্তি দিয়ে। ব্যাপক অর্থে তিনি সকল মানুষের কবি, বিশ্ব মানবতার কবি, মানুষকে তিনি মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কবি। বিশ্বমানবের এ বন্ধু যে কেবল তাঁর সাহিত্য সাধনা দিয়ে মানুষের জন্যে কাজ করেছেন তা কিন্তু নয়। মানবতার এ বন্ধু কেবল একজন কবি-সাহিত্যিক হিসেবে নন, বরং সৈনিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, পত্রিকা-পরিচালক, রাজনীতিক, ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কারক, দার্শনিক, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুক্তিযোদ্ধা ইত্যাদি কত না চরিত্রে তিনি মানবতার জন্যে কাজ করেছেন তার হিসেব করাও আমাদের পক্ষে বোধ হয় প্রায় অসম্ভব। তিনি সকল মানুষকে মানুষের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার নিরলস সাধনা করেছেন যার মধ্য দিয়ে রচনা করে গেছেন বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডারের অমূল্য সব সম্পদ। তিনি সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষের জন্যে রেখে গেছেন সঞ্জীবনী শক্তি, জীবনের রসসুধ- যা পান করে প্রতিটি মানুষ স্বীয় জীবনকে অর্থবহ করার প্রেরণা লাভ করতে পারে, গড়ে উঠতে পারে একটি সুন্দর পৃথিবী।

লেখক: উপসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়। নজরুল গবেষক, নজরুল বিষয়ক টিভি অনুষ্ঠান পরিচালক ও সঞ্চালক। বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক, ১৯৯১ সালে কুমিল্লা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথমস্থানসহ ডাবল বোর্ড স্ট্যান্ড, এলএল.বি (অনার্স), এলএল.এম (প্রথম শ্রেণি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পরীক্ষক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: jehaduddin77@gmail.com

অলকপ্রেমী নজরুল

পীযুষ কুমার ভট্টাচার্য্য*

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সাহিত্য ও সঙ্গীতে কিংবদন্তী। তাঁর বাণী ও সুরের মাধুর্যে সঙ্গীত বৈচিত্রময়। কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীত রচনার পাশাপাশি সুরকার, স্বরলিপিকার, সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক, রাগ স্রষ্টা এবং তাল স্রষ্টা হিসেবে অতুলনীয়। তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের গান রচনা করেন। যেমন: দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী (উদ্দীপনামূলক) গান, প্রেম ও প্রকৃতির গান, ইসলামি গান ও ভক্তিগীতি (শ্যামা, ভজন ও কীর্তন), পল্লিগান, গজল প্রভৃতি। নজরুল রচিত সঙ্গীতগুলোতে যেমনি করে সৃষ্টিশীল আবেগের অপূর্ব বাণীমূর্তি প্রকাশ পায়, তেমনি করে প্রকাশ পায় সুরমূর্তি। এই স্বল্প পরিসরের লেখনীতে নজরুলের গজল পর্যায়ের 'আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন দিল ওহি মেরা ফঁস্ গয়ি' গানটি নিয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করার চেষ্টা।

'আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন দিল ওহি মেরা ফঁস্ গ্যেয়ি।
বিনোদ বেণীর জরীন ফিতায় আব্ধা এশ্‌ক্ মেরা কস্ গ্যেয়ি।

* *লেখক ও নজরুল গবেষক*

তোমার কেশের গন্ধ কখন,
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন
বেহুঁশ হো কর গির হাথ মে বাজু বন্দ মে বস্ গ্যেয়ি।
কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া,
আঁখ্, ফিরা দিয়া চোরী কর নিন্দিয়া
দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া আউর নহিঁ উয়ো ওয়াপস্ গ্যেয়ি।
তথ্যসূত্র : কাজী নজরুল ইসলাম: নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ, পৃ. ৬৫১ ও ৬৫২।

নজরুল তাঁর রচিত গজল গানে নানা রকম রাগ-রাগিণীর ব্যবহার করেন। তিনি গজলে ব্যাপকভাবে আরবি ও ফারসি শব্দ ব্যবহার করেন। আরবি ও ফারসি শব্দের প্রয়োগ মানবচিত্তে এক অনন্য স্থান করে নিয়েছে। ফলে নজরুলের গজলগুলো সঙ্গীত ভাণ্ডারে অত্যুজ্জ্বল। বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের গজল গান সম্পর্কে একটা প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন: 'নজরুল গজল গানের স্রষ্টা এবং সফল প্রবর্তক। এ ধারাটি সম্পূর্ণ তাঁরই অবদানে পুষ্ট। তাঁর পূর্বে, অতুল প্রসাদের গানে গজলের কিছু

গুঞ্জরণ শোনা গেলেও, সেগুলি সার্থক হয়ে ওঠেনি। সেগুলিতে বাংলা

গানের আমেজ ছিল না এবং সংগীত রসলিপ্সু বাঙালী মানসে তার

কোন ছাপ পড়েনি। গজলের আদি নিবাস পারস্যে। পারস্যের প্রেমসংগীত রূপায়ণের জন্যই গজলের জন্ম। গজলের মোটামুটি দুটি অংশ-অস্থায়ী এবং অন্তরা। অস্থায়ী অংশটা সুর এবং তাল সহযোগে গাওয়া হয় এবং অন্তরা অংশটি তাল ছাড়া সুরের টান রেখে আবৃত্তির ভংগীতে উচ্চারণ করা হয়, এই অংশকে বলা হয় 'শের' বা 'শেয়র'। বিলম্বিত লয়ে অন্তরার এই অংশটির সুরবদ্ধ আবৃত্তি শেষ হওয়া মাত্র যখন আস্হায়ীতে ফেরা হয় তখন হঠাৎ সুর ও তালের ছন্দোবদ্ধ যোজনায় একটি অপূর্ব সংগীতের আমেজ ও স্ফুর্তির প্রকাশ ঘটে। বলাবাহুল্য সাধারণ গানে এটি হয় না। গজলের গায়ক, বাদ্যকারগণ এবং শ্রোতাবৃন্দ এই সংগীত মূর্চ্ছনার মুহূর্তটুকুর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। 'শের' অংশ অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্য সমৃদ্ধ - এই অংশের কাব্যগুণ শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। অন্তরা থেকে আস্থারিতে ফেরার সময়... "সঙ্গীতকারের..." নৈপুণ্য দেখাবার অবকাশ ঘটে। এ অনেকটা ঠুংরীর মুখপাতের অংশ চক্রাকারে পুনরাবৃত্ত হওয়ার সময় ছন্দের নিপুণ কাজের মত। তবে ঠুংরীর সঙ্গে গজলের এই অংশের তালক্রিয়ার প্রধান তফাৎ এই যে, ঠুংরী গাওয়া হয় সাধারণত: দাদরা বা আদ্ধা তালে; আর গজল গাওয়া হয় প্রায়শ: সাধারণ কাহারবা তালে।'

(তথ্যসূত্র : কাজী নজরুল ইসলাম : শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি, স্বরলিপি : নিতাই ঘটক, পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: আবদুল আজীজ আল আমান, পৃ. ১৮।)

গজল প্রেম সঙ্গীত বা প্রণয়বিষয়ক গান। এই ধরনের গানে রসের বিষয় অপূর্বরূপে চিত্রিত হয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা গানটি কাহারবা তালের। এই গানটিতে প্রেমিকার খোঁপার বাঁধনের প্রতি প্রেমিকের তৃতীয় নয়নের আলো গিয়ে পরে। প্রেমিকার কেশের দেশের প্রতি প্রেমিকের সুদৃষ্টি গিয়ে পড়ায় হাত দিয়ে খোঁপার বাঁধন খোলার প্রাণের অনুরোধ উচ্চারিত হয়। কেশকুঞ্জে প্রেমাভিসারীর ঐশীবাণী চমৎকাররূপে চিত্রিত হয়েছে। সুন্দর বেণীর সোনালি ফিতায় প্রেমিকার অপরূপ সাজে অন্ধভক্ত প্রেমিকের হৃদয় আত্মহারা। মনের অজান্তে কেশের সুগন্ধে কেশবিহারী প্রেমোন্মাদনায় যেনো এক শিহরিত প্রণয়ী। অলক আধারে প্রেম সঞ্চরণে প্রণয়ীর বেশে বেহুঁশ হয়ে কেশে হাত গিয়ে পৌঁছানোর এক হৃদয় বাসনা। প্রেমাদি বিহারী কানের দুল পরা অবস্থায় প্রেমিকাকে দর্শন করে বিমোহিত। সেই মুহূর্তে প্রেমিকের চোখের পলক আর পিছু হাটে না। প্রেমিকা যখন বাড়ির সদর দরজা দিয়ে প্রেমিকের কাছে এসে পৌঁছায় তখন প্রেমিক চিত্তে এক অদ্ভুত অনুভূতি দোলা দেয়। শুধু মনে হয় প্রেমিকা যেনো আর ফিরে না যায়। মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে রাখতে চায়।

উল্লেখ্য গানটি প্রসঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য তুলে ধরা হলো:

'গ্রন্থ : বনগীতি

শ্রেণী - গজল

বি.দ্র. : গানটির প্রামাণ্য সুর পাওয়া যায় নি। প্রচলিত

স্বরলিপির সুর পরবর্তীকালে বানানো হয়েছে।'

তথ্যসূত্র : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর: নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা, পৃ.৭৮।

সামঞ্জস্য শব্দের গাঁথুনীতে উল্লিখিত সঙ্গীতটি প্রাণবন্ত হয়েছে। নারীকেশ প্রেমার্তির চিত্ত দোলা দিয়েছে। কেশপাশে নববেশে প্রেমিক যেনো মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পরে। কেশগিরিতে প্রেমিকের প্রেমার্ঘ্য প্রজ্বলিত।

নজরুল রচিত সঙ্গীতগুলো তাঁর আত্ম উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। তাঁর রচিত সঙ্গীতের আবেদন চিরদিন অম্লান থাকবে।

তথ্যঋণ:

০১.কাজী নজরুল ইসলাম : শ্রেষ্ঠ নজরুল স্বরলিপি, স্বরলিপি : নিতাই ঘটক, পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: আবদুল আজীজ আল আমান, পরিমার্জিত শতবার্ষিকী সংস্করণ শুক্রবার ২০ এপ্রিল ২০০৭, প্রকাশক, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

০২. কাজী নজরুল ইসলাম : নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬, প্রকাশক, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

০৩. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর : নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা, প্রথম সংস্করণ, ২৫ মে ২০০৯, প্রকাশক, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

নজরুল সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা

সৈয়দ আল জাবের

বিশ শতকের বিস্ময়কর সাহিত্য প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম(১৮৯৯-১৯৭৬)। বাংলা সাহিত্যের যুগস্রষ্টা কবি নজরুল, যিনি বাংলা সাহিত্যের ধারা ভিন্ন ও নতুন দিকে প্রবাহিত করেছেন। তিনিই প্রথম সর্বমানবিক মানসের প্রয়াস, প্রয়োগ ও প্রকাশ ঘটিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। কাজী নজরুল ইসলামই তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে ও অভিভাষণে সাধারণ মানুষের, গণ-মানুষের জয়গান গেয়েছেন, নিপুণ হাতে লিখেছেন তাঁদের দুঃখ-বেদনা ও হাহাকার। অসাধারণ ও অনন্য সে বয়ান ও বুনন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য ও শিল্প কর্মের অন্তরালে যে অনুভূতি ও অভিপ্রায় নিহিত ছিল তা হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিশ্বাস। বাইশ বছরের সাহিত্য জীবনের প্রতি পৃষ্ঠায় কেবল এই চেতনারই অনুলিপির প্রতিফলন দেখা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) বিভীষিকাময় প্রতিবেশ , পাশবিক উল্লাস, গণহত্যার নির্মম উৎসব কবি নজরুলকে বিচলিত করে প্রবলভাবে। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় দাঙ্গা, মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ, বর্ণ-জাত জিঘাংসা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, অবজ্ঞা, অবহেলা ইত্যাদি অমানবিক আচরণ ও মানবিক বিপর্যয়ের করুণ দৃশ্য যা মূলত ঔপনিবেশিকতার ফসল।

তা নজরুল সাহিত্যের অসাম্প্রদায়িক চেতনা তৈরিতে প্রভাবকের ভূমিকা রেখেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের আগে ও পরে সুস্পষ্ট ভাবে কোন সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা উচ্চারণ করেননি। প্রায় সকলের সাহিত্যকর্ম সাম্প্রদায়িকায় আক্রান্ত। শুধু বাংলা নয় বিশ্বসাহিত্যেও নজরুল এক বিরল সাহিত্য ব্যক্তিত্ব।

কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব পরাধীন ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ বহুধর্ম ও সংস্কৃতির দেশ। বিচিত্র ও বৈচিত্রের দেশের মানুষের বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন পরমত ও পরধর্মসহিষ্ণু মনোভাবের যা তাঁর সমকালে ছিল অনুপস্থিত। তাই সামাজিক জীবনে ছিলনা কোন সদ্ভাব ও সম্প্রীতি। ভারতবর্ষের দুই বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সুন্দর ও কল্যাণকর সম্পর্ক তৈরির জন্য সাহিত্য রচনা করেন নজরুল। বেছে নিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথ। অসাম্প্রদায়িক চেতনা মানে হলো কোন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি এবং সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব না পোষণ করে মানবিক আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির লালন করা। আজকাল অসাম্প্রদায়িক-সাম্প্রদায়িকতার নামে যে চেতনার কথা কলকলিয়ে বলা হচ্ছে ও প্রচার চলছে তা মূলত ইসলামের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও বাঙালিয়ানার মোড়কে হিন্দু ধর্মীয় পৌত্তলিকতার নামান্তর। কবি নজরুল ইসলাম মোটেই এরকম তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা বলেননি, লেখেননি বিশ্বাসও করেননি। তাঁর সমগ্র সাহিত্য পাঠে তা-ই বুঝা যায়।

আমরা নজরুল সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়-আচার, রীতি-নীতি নিয়ে লেখা দেখতে পাই। কবি নজরুলের এমন মানস কীভাবে তৈরি হলো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে আমরা জানতে পারি নজরুল শৈশবে-কৈশোরে মক্তবে পড়তেন ও পড়াতেন, মসজিদে ইমামতি করতেন। যার মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্মের মানবিক চেতনা ও বিশ্বাসের কথা জেনেছেন। ইসলাম ধর্ম থেকে শিখেছেন 'লা ইকরাহা ফিদদ্বীন' ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই(সূরা বাকারা, আয়াত-২৫৬)।আরও জেনেছেন, 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন'(সূরা কাফিরুন) । নজরুল কিশোর বয়সে লিখেছেন 'লেটো' দলের জন্য গান। পড়েছেন বিপুল পরিমাণে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ।

এ প্রসঙ্গে সুশীলকুমার গুপ্তের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য– 'যেখানে কীর্তন হত, কথকতা হত, যাত্রাগান হত, মৌলবীর কোরান পাঠ ও ব্যাখ্যা হত, দুরন্ত বালক গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। বাউল, সুফী, দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন।' (নজরুল চরিতমানস, ড.সুশীলকুমার গুপ্ত)।

এভাবেই অসাম্প্রদায়িক মানস ও চেতনার ধারক ও বাহক হলেন কবি নজরুল। শুধু সাহিত্যেই নয় তিনি তাঁর বাস্তব জীবনেও অসাম্প্রদায়িক চেতনার সাক্ষর রেখেছেন। বিয়ে করেছিলেন হিন্দু মেয়ে প্রমীলা দেবীকে। এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেছেন,'কারুর কোনো ধর্মমত সম্বন্ধে আমার কোনো জোর নাই। ইচ্ছে করে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে,

পরেও করতে পারবেন।' (যুগস্রষ্টা নজরুল, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন)

'গাহি সাম্যের গান-

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি!

(মানুষ, সাম্যবাদী)

বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য উচ্চারণ। মানুষের জন্য, মানুষের পক্ষে, মানবতার সুউচ্চ ও উচ্চকিত মহান এ বাণী কেবল কবি নজরুলের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব হয়েছে। সমকালে কেউ করেনি এমন। মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ। একজন কবির কবি মানস কতটা মানব প্রেমের আকর হলে এমন সর্বমানবীয় অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাণী উচ্চারিত হতে পারে।

তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় দেখি আরেক সাহসিকতার পরিচয়, তিনি লিখেছেন,

'গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।'
(সাম্যবাদী)

কী অসাধারণ মমতায় লিখেছেন কবি নজরুল। সব মানষের মানবিক পরিচয়ে বন্ধন কামনা করে ব্যবধান ঘুচাতে চেয়েছেন। এখানে কোন ধর্মের প্রতি নেই কোন বিরূপ মনোভাব ও বিদ্বেষ। কোন ধর্মের প্রতি নেই কোন বিরোধ। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে সব ধর্মের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতিই কামনা করেছেন নজরুল। ধর্মের নামে অধর্মের বিনাশই চেয়েছেন তিনি। অধর্ম কোন কালেই ধর্মের সৃষ্টি নয় তা কায়েমীস্বার্থবাদীদের তৈরি করা মনগড়া নিয়ম। নজরুল সে সবের মূলে আঘাত করেছেন।

তিনি লিখেছেন,

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়কো মোয়া ।।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাবলি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ'-খান।
এখন দেখিস ভারত জোড়া পচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া।'
(জাতের বজ্জাতি, বিষের বাঁশি)

জাত দিয়ে মানুষের বিচারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন কবি নজরুল। বর্ণ-জাত

কোনভাবেই স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়ার উপায় হতে পারে না। এগুলো অধর্ম, এসব সমাজসৃষ্ট কুসংস্কার । কাজী নজরুল ইসলাম এখানে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের, ভেদ-বুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত করে মানুষের জয়গান গেয়েছেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যের নাম 'অগ্নি-বীণা'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। এ কাব্যে মোট ১২টি কবিতা রয়েছে। এই কাব্যে যেমন আছে ইসলামি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বয়ান, তেমনি আছে হিন্দু ধর্মের পুরাণ-পার্বনের কথা। এমন সমাহার বাংলা সাহিত্যে নেই। এরকম অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ কাব্য দ্বিতীয় নেই।

কবি নজরুল তাঁর 'পুতুলের বিয়ে' নাটকে যা তাঁর 'সুর-সাকী'তেও আছে তাতে লিখেছেন–

'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান।।
এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলাই একই ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মাশানে ঠাঁই
এক ভাষাতে মা'কে ডাকি, এক সুরে গাই গান।।'

এই গানে নজরুল তাঁর অনন্য অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। একই দেশে বাস, একই পানি পান করি, একই হাওয়া নিই, আবার একই মাটিতে আমাদের ঠাঁই, এরপর কেন বিভেদ থাকবে আমাদের মাঝে ! একই আকাশের নিচে হার্দিক সম্পর্কে মিলেমিশে থাকবো সবাই, এই বাসনাই করেছেন নজরুল।

কাজী নজরুল ইসলাম দু'হাত ভরে লিখেছেন হিন্দু-মুসলমানের জন্য গান-গজল, হামদ-না'ত, কীর্তন-শ্যামাসঙ্গীত। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি। মনে ও মননে পোষণ করেননি ধর্মের কারণে বিদ্বেষ ও রিরংসা, দেননি কোন সংকীর্ণতার পরিচয়। লিখেছেন–

'আমার কালো মেয়ের পায়ের নীচে
দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব

যার হাতে মরণ বাঁচন
আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল গগন'
(বনগীতি)

আবার তিনিই লিখেছেন–
তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে।
যেন ঊষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে
(জুলফিকার)

এমন উদার অসাম্প্রদায়িক সাম্যবোধ ও চেতনার দৃষ্টান্ত বিরল বাংলা সাহিত্যে। নজরুল সাহিত্যের পরতে পরতে এমন উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর সাহিত্য কর্মের প্রকৃত সুরই হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বিশ্বাস। কবি নিজের সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজেই তাঁর বিখ্যাত অভিভাষণে বলেছেন–

'কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও দুটোর একটিও নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'

এ থেকেই অনায়াসে আমরা বুঝতে পারি কবি নজরুলের সাহিত্য চেতনা। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র স্পষ্ট ও অকপট অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকপাল।

সৈয়দ আল জাবের, লেখক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব
৯৫ গোল্ডেন প্লাজা, সিদ্ধেশ্বরী রোড, (মৌচাক) ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯২০১৩৬৩৪৪

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিক জীবন

আনোয়ারুল কাইয়ূম কাজল

কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় জাগরণ,মানবতা, সাম্য-মৈত্রী, প্রেমও দ্রোহের-অগ্রসেনানী কবি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতি সত্তার বংশীবাদক। যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানবতার জয়গান। বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠকবি কাজী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। সে বিদ্রোহ হচ্ছে সকল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে। তবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। নজরুল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের

১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন মসজিদের ইমাম ও মাযারের খাদেম। নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া ' ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যু হলে নজরুল পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য হাজী পালোয়ানের মাযারের সেবক এবং মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ করেন। তিনি গ্রামের মকতব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। শৈশবের এ শিক্ষা ও শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে নজরুল অল্পবয়সেই ইসলাম ধর্মের মৌলিক আচার-অনুষ্ঠান, যেমন পবিত্র কুরআন পাঠ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতে ইসলামি ঐতিহ্যের রূপায়ণে ওই অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়েছিল

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি'এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণমুক্ত কবিতা রচনায় তাঁর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী কবিতার জন্যই ' ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিতার সৃষ্টি সহজতর হয়েছিল বলে মনে করা হয়। নজরুল সাহিত্যকর্ম এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ এবং দেশি-বিদেশি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। এ কারণে ইংরেজ সরকার তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ও পত্রিকা নিষিদ্ধ করে এবং তাঁকে কারাদন্ডে দণ্ডিত করে। নজরুলও আদালতে লিখিত রাজবন্দীর জবানবন্দী দিয়ে এবং প্রায় চল্লিশ দিন একটানা অনশন করে ইংরেজ সরকারের জেল-জুলুমের প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং এর সমর্থনে নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে শ্রদ্ধা জানান।

নজরুল তাঁর কবিতায় ব্যতিক্রমী এমন সব বিষয় ও শব্দ ব্যবহার করেন, যা আগে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। কবিতায় তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক যন্ত্রণাকে ধারণ করায় অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তবে মানবসভ্যতার কয়েকটি মৌলিক সমস্যাও ছিল তাঁর কবিতার উপজীব্য।

নজরুলতাঁর সৃষ্টিকর্মে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের পরিচর্যা করেন। কবিতা ও গানে তিনি এ মিশ্র ঐতিহ্য চেতনাবশত প্রচলিত বাংলা ছন্দোরীতি ছাড়াও অনেক সংস্কৃত ও আরবি ছন্দ ব্যবহার করেন। নজরুলের ইতিহাস-চেতনায় ছিল সমকালীন এবং দূর ও নিকট অতীতের ইতিহাস, সমভাবে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব

আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল। বাংলা সাহিকত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র । ব্যক্তিত্ব, কাজী নজরুল ইসলাম মূলত কবি। হলেও সাংবাদিক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় ব্যয় করেছিলেন। তা নিয়ে আমাদের ভেতরও তেমন আলোচনাও হয় না। সাংবাদিকতা ও সাহিত্য চর্চা একটি অন্যটির পরিপূরক।

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক যেদিকেই নজরুল কাজ করেছেন। সেদিকেই অনিন্দ্য সুন্দর ফুল ফুটেছে। সে কাননে সবুজ ডাল-পালা চারদিকে পল্লবিত হয়েছে। এমনকি সাংবাদিকতায়ও নজরুল একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করে আছেন। বিভিন্ন সাময়িকপত্র তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য ও অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। নজরুলের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল সেনাবাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে অস্ত্র হাতে নেয়ার মধ্য দিয়ে। করাচি সেনানিবাসে হাবিলদার পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়। করাচি সেনানিবাস থেকে প্রেরিত তাঁর কয়েকটি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ কলকাতার ' সওগাত', ' প্রবাসী' এবং ' বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে নজরুল দেশে ফিরে কলকাতায় সাহিত্যিক-সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম আশ্রয় ছিল ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি-র অফিসে সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে।

নজরুল এবং মুজফফর আহমদ সমকালীন অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের চিন্তা-ভাবনা করেন। সে সময়ের অন্যতম খেলাফত নেতা ও হাইকোর্ট আইনজীবী একে ফজলুল হক এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ দেন এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হন। ১৯২০ সালে ২ জুলাই দৈনিক নবযুগ' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসেবে একে ফজলুল হকের নাম মুদ্রিত হলেও মূলত নজরুল এবং মুজফফর আহমদই ছিলেন এ পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক। সাংবাদিকতায় এ দু'জনের কারোরই কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পত্রিকাটি পাঠক সমাজে বিশেষ সাড়া জাগায় এবং পাঠক প্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। নির্ভীকতা হচ্ছে সাংবাদিকতার প্রধান ধর্ম, সেই নির্ভীকতা ছিল নজরুলের আজন্ম শপথ। সে কারণেই পত্রিকাটি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নজর কাড়তে সক্ষম হয়। আর অন্যদিকে বিশেষত এ কারণেই তদানীন্ত বৃটিশ সরকারের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে পত্রিকাটির উপর। পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে' শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য পত্রিকাটির জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কমরেড মুজফফর আহমদের স্মৃতি কথায় জানা যায় 'প্রবন্ধ প্রকাশের আগে নজরুলের গরম লেখার জন্য পর পর দু'বার কিংবা তিনবার সরকার 'নবযুগ' পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন'। 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে নজরুলের জ্বালাময়ী ও আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হতো।

নজরুলের সাংবাদিক প্রতিভা সম্পর্কে মুজফফর আহমদ নিজেই বলেন, '(নজরুল ইসলাম) বড় বড় সংবাদগুলো খুব সংক্ষিপ্ত করে নিজের ভাষায় লিখে ফেলতে লাগলো। তা না হলে কাগজে সংবাদের স্থান হয় না। নজরুলের বড় বড় সংবাদের সংক্ষেপণ

করতে দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ঝানু সাংবাদিকরাও এ কৌশল আয়ত্ত করতে হিমশিম খেয়ে যান।'

'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার জনপ্রিয়তার আরেকটি কারণ ছিল নজরুলের দেয়া সংবাদ হেডিং। প্রত্যেকটি সংবাদের হেডিং ছিল পান্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধ। হেডিং পাঠ করলেই বুঝা যায় যে, এগুলো তাঁর হাতের সৃষ্টি। হেডিংয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য তিনি লোক সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনারও দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার পংক্তি ভেঙে নতুন হেডিং রচনা করেছেন

যেমন–

১. আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরাণ সখা ফৈসুল, হে আমার।

২. কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার মন্দ মধুর হাওয়া দেখি নাই। কভু দেখি নাই ওগো, এমনি ডিনার' খাওয়া,

নবযুগ' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯২২ সালের মে মাসে নজরুল দৈনিক সেবক' পত্রিকায় যোগদান করেন। এ পত্রিকার মালিক ছিলেন মাওলানা আকরম খাঁ। দুর্ভাগ্যক্রমে নজরুল এই পত্রিকার সঙ্গে বেশিদিন যুক্ত থাকতে পারেননি। ১৯২২ সালের ২৫ জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোক গমনের পর নজরুল এক বিরাট সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটিতে নজরুলের অনেক আবেগ ও উচ্ছবাস ছিল। লেখাটি কর্তৃপক্ষের মনঃপুত হয়নি। ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট নজরুলের সম্পাদনায় অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। 'নবযুগ' পত্রিকায় নজরুলের বিশেষ ভূমিকার পর 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রকাশ ছিল একান্তই যেন অবধারিত। পত্রিকার অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রমুখ অনেকেই আশীর্বাণী প্রেরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী ছিল-

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে,
আছে যারা অর্ধচেতন।

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 'ধূমকেতু' পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলা হয় :

'আমার কর্ণধার আমি। আমার পথ দেখাবে আমার সত্য। আমি প্রথমে আমার যাত্রা-শুরুর আগে আমার সত্যকে সালাম জানাচ্ছি- নমস্কার করছি আমার সত্যকে। দেশের যারা শত্রু। দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভন্ডামি, মেকি তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী। 'ধূমকেতু' কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মানুষ্য ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্যে।'

নজরুল ইসলাম ধূমকেতু' পত্রিকা প্রথম ভারতের পূর্ণস্বাধীনতার কথা তেজস্বী ভাষায় ব্যক্ত করেন। সম্পাদকীয়তে নজরুল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন : 'সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা এ কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন।

ভারত বর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসন ভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।'

'ধূমকেতু'র দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক কবিতার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। 'নবযুগ' পত্রিকার ন্যায় 'ধূমকেতু' পত্রিকায়ও নজরুল বিশেষ কুশলাদি প্রদর্শন করেন। যেমন-লাঠি যার মাটি তার' (৭ম সংখ্যা)

'মহরম নিয়ে দহরম মহরম' (৮ম সংখ্যা)।

সুকৌশলে তিনি স্বরচিত কবিতাও সংযোজন করেছেন।

১. পরের মুল্লুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত (৮ম সংখ্যা)। নবযুগে' প্রকাশিত সংবাদটি রসগ্রাহী করার মানসে সংবাদের মাঝখানে ছড়াও পরিবেশিত হয়েছে।

যেমন-

শুরুতেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সদ্যোরচিত বাঁধন-হারা উপন্যাস এবং বোধন,শাত-ইল-আরব,বাদল প্রাতের শরাব, আগমনী, খেয়া-পারের তরণী, কোরবানী, মোহররম, ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌দহম্‌, প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যের এ নবীন প্রতিভার প্রতি সাহিত্যানুরাগীদের দৃষ্টি পড়ে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রের মাধ্যমে নজরুলের 'খেয়া-পারের তরণী'এবং বাদল প্রাতের শরাব' কবিতাদুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বাংলার সারস্বত সমাজে তাঁকে স্বাগত জানান। নজরুল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, আফজালুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন।

অপরদিকে কলকাতার তৎকালীন জমজমাট দুটি সাহিত্যিক আসর গজেনদার আড্ডা' ও ভারতীয় আড্ডায় অতুলপ্রসাদ সেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্ড়াদ করমতুল্লা খাঁ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশিরকুমার ভাদুঙী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার সমকালীন শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্যজগতের দিকপালদের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। নজরুল ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; তখন থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দু দশক বাংলার দুপ্রধান কবির মধ্যে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন ছিল।

শেরে-বাংলা এ.কে ফজলুল হকের সম্পাদনায় অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯২০ সালের ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ প্রকাশিত হলে তার মাধ্যমেই নজরুলের সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। নজরুলের লেখা মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে?' প্রবন্ধের জন্য ওই বছরেরই আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় এবং নজরুলের ওপর পুলিশের দৃষ্টি পঙে।

নবযুগ পত্রিকার সাংবাদিকরূপে নজরুল যেমন একদিকে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক জগতের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা নিয়ে লিখছিলেন, তেমনি মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হচ্ছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন ঘরোয়া আসর ও অনুষ্ঠানে যোগদান এবং সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তরুণ কবির সংস্কৃতিচর্চাও অগ্রসর হচ্ছিল।

লেখক: কবি,সাংবাদিকও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব
বার্তা প্রযোজক,একুশে টেলিভিশন,জাহাঙ্গীর টাওয়ার,১০ কাওরান বাজার,ঢাকা-১২১৫
kazalnca@gmail.com,
cell no: 01715o20229

কাজী নজরুল ইসলাম : মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়

সুহৃদ সাদিক

পরাধীন ভারতবর্ষের এক রাজনৈতিক ক্রান্তিলগ্নে বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আবির্ভাব। সমকালে শাসক ইংরেজদের দুঃশাসন-শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, কংগ্রেস রাজনীতিতে

গান্ধীজির অহিংসা আন্দোলনের প্রবর্তন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, স্বদেশী আন্দোলন, খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রভৃতিতে ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গন হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ। সেই সাথে অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার, অসাম্য, সংস্কার-কুসংস্কার, ঘৃণা-লোভ-হিংসা প্রভৃতিতে বিপর্যস্ত যখন সাধারণ বাঙালি সমাজ, তখন বাংলা কাব্যে নজরুলের আবির্ভাব প্রতিথিয়ুসের মতো। তাই বাংলা সাহিত্যে তিনি 'বিদ্রোহী কবি 'হিসেবে খ্যাত। ওই বিদ্রোহী কবিসত্তায় সূত্র ধরেই তিনি নিপীড়িত-শোষিত জনের বন্ধু, বাংলা কবিতায় প্রথম সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার, পথ-প্রদর্শক, আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের একজন সার্থক বাণীবাহন, দেশপ্রেমের এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, সর্বোপরি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক অকৃত্রিম উদগাতা।[১] শুধু কাব্য ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা গদ্য সাহিত্যেও নজরুলের প্রতিভা অসাধারণ। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, গান প্রভৃতি শিল্প-আঙ্গিকেও তাঁর দক্ষতা ও পারদর্শিতা বিশেষভাবে স্বীকার্য। বিপুল আবেগের ও সংবেদনায়, কবিসত্তার একনিষ্ঠ আন্তরধর্মে আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম 'স্বতন্ত্র কবি'।[২] ইউরোপীয় রেনেসাঁস লব্ধ পাশ্চাত্য বুর্জোয়া জীবনাদর্শ ও বিশ্ব-শিল্পসৃষ্টির সংস্পর্শে বাঙালির আধুনিক ভাব-পরিমণ্ডলে যে ইতিবাচক আবহ তৈরি হয়েছিল তারই শিল্পীত প্রকাশ নজরুল ও তাঁর কবিতা। নবযুগের মানবিকচেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর কবিতায় যুক্ত করেছে নবতর তাৎপর্য; পুরনো ঐতিহ্যের সাথে একাত্ম হয়েছে সমকালীন জীবনার্থ ও মানবিক অনুষঙ্গ। ঊনিবিংশ শতাব্দীর অস্থির সমাজ-প্রতিবেশে মাইকের মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) রামায়ণের রাবণকে আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি চিত্তে স্থাপন করে আধুনিকতার যে জীবন বীজ উপ্ত করেছেন, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তা করে তুলেছেন বিশ্বপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভাবস্পর্শী নান্দনিক শিল্পভাবনায় সমাহিত না হয়ে নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় আবির্ভূত হলেন স্বতন্ত্র বক্তব্য ও বাণী ভঙ্গিমা নিয়ে। তাঁর আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতার হাজার বছরের গতিস্রোত হলো ভিন্নমুখী; সে স্রোতে যুক্ত হলো অভাবিত কলধ্বনি। পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় সচেতন ভারতবাসী মুহূর্তেই জেগে উঠল 'বিদ্রোহী'র উচ্চকণ্ঠ আহ্বানে। নজরুলের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা শক্তি সংগ্রহ করেছে ফরাসি বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের ঐতিহ্য এবং শেলি, হইটম্যান, গোর্কির সাহিত্য থেকে। স্বাধীনতাপ্রীতি এবং বিপ্লবী আবেগের সমন্বয়ে তিনি শেলির যথার্থ উত্তরসূরি এবং শওকত ওসমানের ভাষায় 'গোর্কির মানসপুত্র'।[৩] শিল্পের চেয়ে জীবন বড়– তা তিনি বিশ্বাস করতেন। আর তাই মার্কসবাদ, সন্ত্রাসবাদ কিংবা ইসলামী জাগরণের পরস্পরবিরোধী চেতনায় তিনি সাড়া দিয়েছেন। তাঁর প্রতিভার এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের বাঙালি পাঠক রহস্যাকুল হয়েছে, হয়েছে দ্বিধাগ্রস্ত।

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতা ও গানের জগতে যতখানি নন্দিত, ছোটগল্প ও উপন্যাসের ধারায় ততখানি নয়। কিন্তু এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। কেননা, কথাসাহিত্যের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম পদচারণা এবং এর মধ্য দিয়েই প্রথম অখণ্ড বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর জীবন বাংলা সাহিত্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। তিনি তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। এক. 'বাঁধনহারা', 'দুই. 'মৃত্যুক্ষুধা' এবং তিন. 'কুহেলিকা'। উপন্যাসগুলো যে সময়ে রচিত হয়েছে, সে– সময়টায় পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের পারস্পরিক বিভেদ ও অবিশ্বাস। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে যার অশুভ বীজ বপন করেছিল। নজরুল সাহিত্যজীবনের প্রথম থেকেই এই অশুভ বীজ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলোয় অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিষয়টি শিল্পসম্মতভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসের বিষয়বস্তু, চরিত্র, সংলাপ ও ভাষার মাধ্যম। সুতরাং বাংলা কথাসাহিত্যে নজরুলের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। সমালোচকের মতে,

"কবি নজরুলের চেয়ে কথা– সাহিত্যিক নজরুলকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। শুধু কবিতায় নয়, বাংলা গদ্যেও নজরুলের কাব্যধর্মী ভাষা অফুরন্ত পৌরুষে প্রদীপ্ত।[৪]

তুলনামূলকভাবে নজরুলের ছোটগল্পের সংখ্যা অল্প। মাত্র তিনটি গল্পগ্রন্থ 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' ও 'শিউলিমালা'। এছাড়াও দু'একটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্প রয়েছে। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে নজরুল তাঁর 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো লিখেছিলেন। এগুলো কাঁচা বয়সের উচ্ছ্বাস-আবেগপূর্ণ। নজরুলের মতো বিরাট প্রতিভার ততোটা সফল সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি সেগুলো। বলা থাকে, 'তাঁর মহৎ প্রতিভার অসাফল্যের স্বীকৃতি'।[৫] তবে বাংলা সাহিত্যের শান্ত পরিবেশে যুদ্ধের পটভূমি ব্যবহার করে সমকালে নজরুল রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাই নজরুলের গল্পগুলো পৃথক বিচার ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। প্রায় একই সময়ে কাব্যচর্চায় হাত দিলেও কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশে বেশ কিছুদিন কুণ্ঠিত ছিলেন তিনি এবং পাঠকদের কাছেও গাল্পিক হিসেবে তিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কবি নিজেও বলেছেন,– 'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে।[৬]

কবি আবদুল কাদিরের মতে,

'নজরুলের প্রথম জীবনে' রিক্তের বেদন' ও 'ব্যথার দান'-এর গল্পগুলোতে চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থান বড় কথা নয়, আবেগের প্রগাঢ়তা ও কল্পনার ঐশ্বর্যে এগুলো মনে আনে স্বপ্নাবেশ। তরুণ প্রেমের উদভ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও বিরহীচিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এগুলোকে করেছে রস মধুর ও হৃদয়গ্রাহী।[৭]

তবে 'ব্যথার দান' ও 'রিক্তের বেদনের মতো অযৌক্তিক আবেগ-উচ্ছ্বাস নেই 'শিউলিমালা'তে। গ্রন্থভুক্ত চারটি গল্প খাঁটি হয়ে উঠেছে। এগুলোতে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক

ভাষা ব্যবহার করে প্রকারান্তরে কল্লোলের লেখকদের স্বীকৃতি দিয়েছেন নজরুল।
ধ্রুপদী-রোমান্টিক ও বাস্তববাদীর আবরণে নজরুল আমাদের উপমহাদেশের একজন অনন্য সংগীত-প্রতিভা। আধুনিক মননে নিবিষ্ট থেকেও প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগের বহুবিধ সংগীত উপকরণ দ্বারা তিনি তাঁর সৃষট গানকে ঋদ্ধ করেছেন।[৮] ফলে কবি নজরুলের রচিত সংগীত এক স্বতন্ত্র ধারার বাংলা গান হিসেবে বর্তমানে সর্বজনীনতা লাভ করেছে। কখনো মার্গীয়, কখনো বা দেশীয় ভাবধারায় তাঁর গান যুগের সীমাকেও অতিক্রম করেছে। লৌকিকতা, সামাজিকতা, আনুষ্ঠানিকতা কিংবা ধর্মীয় উৎসবতায় নজরুল তাঁর সৃষ্ট গানকে উপযুক্ত বিষয় ও প্রেক্ষাপটে সাজিয়েছেন। তাই দেশ-কাল-ধর্মভেদে নজরুল সংগীত সকলের কাছে সমভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। জনৈক গবেষকের মতে,
'মাটির ধূলিকণা থেকে কল্পনার রাজ্যে ছুটে চলা বা কল্পনার বিলাসিতাকে মাটির ধূলিতে মিশিয়ে নব নব ভাবরসের শিল্পরচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই তাঁর গানে তথা সাহিত্য-সংগীতে বিশ্বময় লৌকিকতার বিস্ময়কর বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে। একজন কবি-রূপ তাঁকে যেমন বিদ্রোহী হিসেবে মূল্যায়ন করি, তেমনি একজন রোম্যান্টিক সংগীতকার রূপেও তাঁকে আমরা সমভাবে অন্তরে অধিষ্ঠিত করি।'[৯]
মোদ্দা কথা এই যে, সাহিত্র ও সংগীতের ভাষায় তিনি যে সুন্দর ও কল্যাণের কথা ব্যক্ত করেছেন তাতে আমরা মানব-তরীতে বয়ে যাওয়ার প্রেরণা খুঁজে পাই।
নজরুল একজন অসাম্প্রদায়িক কবি। তবে নজরুলের যে অসাম্প্রদায়িক বা সাম্যবাদী চেতনা, তা কখনই ধর্মহীনতায় পর্যবসিত হয়নি। ধর্মকে সরাসরি আঘাত নয়, কিন্তু ধর্মের সবরকম অপব্যবহারকে তিনি প্রবলভাবে সাহস নিয়ে আঘাত করেছিলেন। তাঁর এই সাহস আজ আমরা ক্রমশ হারাতে বসেছি। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। 'মন্দির-মসজিদ' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন,
'যিনি সকল মানুষের দেবতা, তিনি আজ মন্দিরের কারাগারে, মসজিদের জিন্দাখানায়, গির্জার gaol– এ বন্দি। মোল্লা-পুরুত, পাদরী-ভিক্ষু জেল-ওয়ার্ডের মতো তাহাকে পাহারা দিতেছে। আজ শয়তান বসিয়াছে স্রষ্টার সিংহাসনে।'[১০]
এরকম কথা আজ কি কেউ লিখতে পারবেন? নজরুলের যে দর্শন তা ছিল মানবযুক্তির এবং বিশেষভাবে শোষিত-নির্যাতিত-উৎপীড়িত মানুষের মুক্তির। বাইরের প্রকাশ বা রূপ দেখে অনেক গোঁড়া মুসলমান যেমন নজরুলকে ইসলামের খাঁচায় পুরে বিচার করতে চেয়েছিলেন, তেমনি আবার তাঁর হিন্দুধর্মের রূপকগুলো অবাধে ব্যবহারের কারণে তাঁকে 'কাফির' বলতেও অনেকে কুণ্ঠিত হননি।[১১] আসলে তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান নিজ নিজ সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ এবং ভালো তার পারস্পরিক স্বীকৃতি ও এক ধরনের মিলনের প্রতীক। আজকে ধর্মের নামে যে বাড়াবাড়ি আমরা দেখি সেখানে নজরুলের জীবনচর্চা ও লেখনি এক ভারসাম্য স্থাপনকারী মহৌষধরূপে কাজ করতে পারে।[১২] তাই নজরুলচর্চার

প্রয়োজন আজ আরো বেড়েছে বৈ কমেনি। সচেতনভাবে আমাদের এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

২৩ বছরের সৃজনশীল সাহিত্যচর্চায় নজরুল যে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা বাংলা সাহিত্রেল জগতে অতুলনীয়। ১৯১৯-১৯৪২ সালে এই ২৩ বছরের নজরুলের বিপুল সৃষ্টিকর্মের তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন,

"তাঁর ২৩ বছরের শিল্প জীবনের নজরুল লেখেন ২২টি কবিতাগ্রন্ত, ৩টি উপন্যাস, ৩টি গল্পগ্রন্থ, ৩টি, নাটক, ২টি কিশোর নাটিকা, ৫টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৪টি সংগীতগ্রন্থ। তার অসুস্থতার পর ও মৃত্যুর পর, আজ পর্যন্ত, তাঁর অসংখ্যা অগ্রন্থিত রচনা সংকলিত হয়ে চলেছে। তাঁর রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা আজো নির্ণীত হয়নি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান তা চার কি পাঁচ হাজারের মতো। পৃথিবীতে কোন একক গীতিকার এত অধিকসংখ্যক গান লিখেননি। বিচিত্রতায় ও বিপুলতায় নজরুল আক্ষরিক অর্থেই অসামান্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই।'[১৩]

নজরুল ইসলাম ছিলেন পরম আত্মবিশ্বাসী। অন্যায়কে অন্যায় বলেছেন, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছেন, অত্যাচারকে বলেছেন অত্যাচার। কারো তোষামোদ করেননি। প্রশংসার বা প্রসাদের লোভে কারো পেছনের যাননি। তিনি শুধু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেননি– সমাজের, জাতির, দেশের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সত্য তরবারি তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ করেছে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন–

'প্রার্থনা করো– যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটির মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত– লেখায় তাদের সর্বনাশ।'[১৪]

নজরুলের এই উচ্চারণ, এই অনুভূতি বর্তমানেও ধ্বনি হচ্ছে– 'হে প্রভু, আজ আবার এই এক ক্রান্তিকালে, আমরা যারা কেবলই এই পৃথিবীকে নানাভাবে বিনষ্ট করছি, নানা স্তরে, তাদের তুমি ধ্বংস কর। করে আমাদের সন্ততিদের জন্য অন্তত এই পৃথিবীতে ন্যায়, নীতি, সত্য, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে দাও।

'সর্ব পাপ দূর হোক,/আকাশ নির্মল হোক,
বায়ু পবিত্র হোক,/এই পৃথিবী গ্লানিমুক্ত হোক।'[১৫]

তথ্যসূত্র :

১. নারায়ণ চৌধুরী, নজরুল চর্চা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৯৪

২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ২৯

৩. আতাউর রহমান নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), নজরুল সমীক্ষণ, ঢাকা, ১৩৭৯, পৃ. ৩০

৪. আহমদ রফিক, নজরুল সাহিত্যে মানবিক চেতনা ও ভার্ষিক বৈশিষ্ট্য, নজরুল জন্মশতবর্ষ

স্মারকগ্রন্থ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৬৯২
৫. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, কলকাতা, ১৩৬৩, পৃ. ১২০
৬. মিহির সেন, ছোটগল্পে নজরুল, বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত), নজরুল স্মৃতি, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৩৬
৭. আবদুল কাদির, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ২০৪
৮. মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি, বাংলা গানের ঐতিহ্য : বিষয় ও রূপবৈচিত্র্য, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৭৭
৯. মাফরুহা হোসেন সেঁজুতি, নজরুল ইসলাম ধর্ম : একটি পর্যালোচনা, ইকরাম আহমেদ (সম্পাদিত), নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা, একত্রিশতম সংকলন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৭
১০. কাজী নজরুল ইসলাম, মন্দির ও মসজিদ, রুদ্রমঙ্গল, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৭০৭
১১. হায়দার আকবর খান রনো, বাংলা সাহিত্যে প্রগতির ধারা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৬৯
১২. এম. এম. আকাশ, নজরুল কেন অনিবার্য, শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), উত্তরাধিকার, ৭১তম সংখ্যা, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৫১
১৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, শ্রেষ্ঠ নজরুল : নজরুল রচনাবলীর প্রকাশিত– অপ্রকাশিত সংকলন, অবসর, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৫৯
১৪. আবদুল কাদির (সম্পাদিত), নজরুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১৩
১৫. শাওলী মিত্র, কথা অমৃত সমান, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ১২৪

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ওপর নজরুল স্টাডি সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার রচনাটি 'গ' বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে।

প্রতিযোগী : সুহৃদ সাদিক, ৩য় বর্ষ (সম্মান), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নজরুলের গানের প্রজ্ঞাময় ব্যাখ্যা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

(১)

অতন্তরে তুমি আছ চিরদিন ওগো অর্ন্তযামী
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তা-ই পাই না তোমারে আমি॥
প্রাণের মতন, আত্মার সম
আমাতে আছ হে অন্তরতম
মন্দির রচি' বিগ্রহ পুজি দেখে হাস তুমি স্বামী॥
সমীকরণ সম, আলোর মতন বিশ্বে রয়েছ ছড়ায়ে
গন্ধ-কুসুমে সৌরভ সম প্রাণে-প্রাণে আছ জড়ায়ে।

তুমি বহুরূপী তুমি রূপহীন-
তব লীলা হেরী অন্তবিহিন।
তব লুকোচুরি খেলা সহচরী আমি যে দিবসযামী।

প্রজ্ঞাময় ব্যাখ্যাঃ

মানুষ তার নিজের মধ্যেই তার অন্তর্যামিকে পেতে পারে। কিন্তু মানুষ তার নিজের মধ্যে তাকে না খুঁজে কেবল বাইরে বাইরে খোঁজাখুঁজি করে। বাইরে মসজিদ মন্দিরে তাকে পাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা তা দেখে তিনি হাসেন অন্তর্যামী কোন একটা নির্দিষ্ট স্থনে আবদ্ধ নহে। পৃথিবীর মধ্যে আলো ও বাতাস যেমন সকল স্থানে বিরাজিত তেমনি সেই প্রজ্ঞাবান শক্তিও সব স্থানে বিরাজ করে।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রূপে তাঁকে দেখা যায়। তার রূপ ধরতে পারা বেশ কঠিন কর্ম। কারণ সেই শক্তি সর্বদা বিস্তৃত। তাকে একটা গন্ডির মধ্যে ভাবা উচিত হবে না। আসলে তার অস্তিত্ব বিশ্বের মাঝে এক মহাশক্তির রূপ। এই শক্তি সব কিছুতেই বিরাজ করে। এই শক্তির বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই। যেখানেই কোন অস্তিত্ব সেখানেই সেই শক্তিময় শক্তি। তাই এই শক্তিময় শক্তির রূপ না খুঁজে প্রকৃত জ্ঞানীসত্ত্বা তাকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। ফলে সবসময় প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা কর্মের মধ্যে তার শক্তির অবস্থানকে উপলব্ধি করে এবং সে তখন সেই শক্তির সাথে নিজেকে একাকার করে ফেলে। নিজের মনের লোভ, দ্বেষ ও মোহকে ত্যাগ করলে সেই শক্তির সাথে মিশে যাওয়া যায় এবং নিজেকে সেই শক্তির সাথী হিসেবে একাকার করে ফেলা যায়। তখনই দুই শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এ অবস্থা অর্জন করতে পারলে নিজেকে সার্থক হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং এটা মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বা অর্জন।

(২)

অন্তরে তুমি আছ, প্রেমময় ওহে হরি।
দিয়াছ যে ভালবাসা, তাই দিয়ে তোমারে বরি॥
যে দিকে তোমারে দেখি
কাতরে তোমারে ডাকি
যে দিকে ফিরাই আঁখি
দাও হে আমারে তরি॥

প্রজ্ঞাময় ব্যাখ্যা

মানুষের অন্তরে মহাশক্তি বিরাজ করে। সেই শক্তিতেই মানুষ শক্তিশালী হয়। তার মধ্যে যে প্রেম ও ভালবাসা তা সবই সেই শক্তি থেকে আগত। মানুষ যখন তার সেই আদি শক্তির সন্ধান পায় তখন সে যে দিকে তাকায়, যে কর্ম করে সবখানেই তাকে তার সেই অনন্ত সত্ত্বাকে দেখতে পায়। সে তখন তার সকল কাজের মাঝে তার প্রভুকে দেখতে পায়। সে তখন আর একা থাকে না। তার সাথে সকল কাজের মাঝে সে সেই অনন্ত শক্তির সাথে একাকার হয়ে যায়। তার মধ্যে আর একাকিত্বের দুর্বলতা থাকে না। তার চারিদিকে সেই মহাশক্তি আকৃষ্ট করে রাখে। সেই শক্তিই তাঁকে সব সময় পাহারা দেয়।

এই অনন্ত কর্মের মাঝে মানুষ ভেসে চলেছে। তার এই কর্মের অস্তিত্ব তাকে অনন্ত সাগরে ভাসিয়ে চলেছে। তার বস্তুময় দুঃখ নিপতিত করে। মানুষ যখন এই দুঃখ বোধকে দেখতে পায় তখন তার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে নিয়ে সে তার এই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হয়। কারণ কেবল তার মধ্যকার শক্তি যখন তাকে সকল কর্মের মাঝে তরী আকরে থাকে তখনই সে কেবল দুঃখের সাগর থেকে নিজেকে তরীকে উঠায়ে ভবপার হতে পারে।

জীবনও একটা অনন্ত যাত্রাস্থল। এই অনন্ত যাত্রাপথে আছে অনন্ত বস্তুরাশির অনন্ত আকর্ষণ। এই আকর্ষণ থেকে মানুষ কোন অবস্থাতেই মুক্তি পায় না। দয়া করে মহাসত্ত্বা যখন তার স্বীয় সাধনার শীক্ততে নিজের অন্তরে ধরা দেয় তখনি সেই শক্তি তরী হিসেবে তার নিকট আসে। সেই প্রজ্ঞার শক্তিতে তরী রূপ প্রজ্ঞাবান সত্ত্বা নিজেকে অনন্ত বস্তু রাশির অনন্ত আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই অনন্ত শক্তির সাথে একাকার হয়ে যায়।

(৩)

আজি নাহি কিছু মোর মান-অপমান বলে।
সকলি দিয়াছি মোর ঠাকুরের রাঙ্গা চরণের তলে
মোর দেহ প্রাণ, জাতি-কুল-মান,
লজ্জা ও গ্লানি আর মান অভিমান,
(আমি) দিছি চিরতরে জলাঞ্জলি গো কালো যমুনায়
মোরে যদি কেহ ভালবাসে আজ জল আসে জলে আঁখি ভরে।
মোর ছল করে সে যে ভালবাসে মোর শ্যাম
মোরে না বুঝিয়া কেহ করিলে আঘাত
কেঁদে বলি, ওরে ক্ষমা কর নাথ
বৃন্দাবনে যে প্রেম মধুর হয় আঘাত নিন্দার ছলে।

প্রজ্ঞাময় ব্যাখ্যা

মানুষ যখন লোভ, দ্বেষ ও মোহ দ্বারা আক্রান্ত থাকে তখন সে সবসময় নিজের মন প্রাণ দ্বারা বাধিত হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে যখন কোন জ্ঞানী প্রজ্ঞাবান গুরুর নির্দেশ মোতাবেক সাধনার দ্বারা নিজের মধ্যে প্রজ্ঞার শক্তি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তখন তার মধ্যে মান-অপমান বলে কোন চিন্তা-চেতনা কাজ করে না। কারণ সমাজের এইসব জাত-কুল, লজ্জা-গ্লানি সবই সমাজের বস্তুর অজ্ঞান চিন্তা-চেতনার দ্বারা মানুষের মনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে তখন তার তৃষ্ণার দ্বারা সৃষ্ট মন দ্বারা লাভ লোকসান দিয়ে সবকিছু নিজের মন দ্বারা বিচার করে। মন দ্বারা বিচার করলে প্রকৃত প্রজ্ঞাবান অর্থ আসে না।

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি স্বত্ত্বা তার প্রজ্ঞার দ্বারা নিজের মধ্যে এক জাতীয় শক্তি অর্জন করে। সেই শক্তির দ্বারা তার জীবনের প্রতি মুহূর্তের যেসব চিন্তা বা কর্ম হয় সেখানে সে সচেতনভাবে সতর্ক থাকে। তাকে তার পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন কর্মদ্বারা আকৃষ্ট করতে পারে না। সে তার সমস্ত তৃষ্ণাময় চিন্তাকে প্রজ্ঞাময় শক্তির দ্বারা যমুনার জলে চিরদিনের জন্যে বিসর্জন দিয়েছে।

আজ প্রজ্ঞার শক্তিতে সে শক্তিশালী হওয়ার কারণে কোন ভালবাসা বা যে কোন সামাজিক বা ব্যক্তিগত আঘাত তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ সে তখন প্রজ্ঞার শক্তির দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। মানুষ যখন নিজে অজ্ঞানতা দ্বারা আক্রান্ত থাকে তখন সে দুর্বল থাকে। ফলে সবকিছুই তাকে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। সেই একই ব্যক্তি যখন সাধনার শক্তির দ্বারা নিজের মধ্যে প্রজ্ঞার শক্তি অর্জন করে তখন কোন বস্তুগত সামাজিক কর্মই তাকে আক্রান্ত করতে সক্ষম হয় না। আর নেই প্রজ্ঞার শক্তিতে সে মহা পরাক্রমশালী সত্ত্বা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লেখক ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

যাহা নাই নজরুলে, তাহা নাই সঙ্গীতে

আনিস রহমান

কথাটা আমি প্রথম শুনলাম বাংলাদেশের সুপরিচিত নজরুল সংগীতশিল্পী সালাউদ্দীন আহমেদ এর ইন্টারভিউ থেকে। সম্প্রতি তিনি ভয়েস অফ আমেরিকার সাংবাদিক আহসানুল হকের সঙ্গে একটি সাক্ষাতকারে বসেন [১]। সেখান থেকেই তাঁর নজরুলের

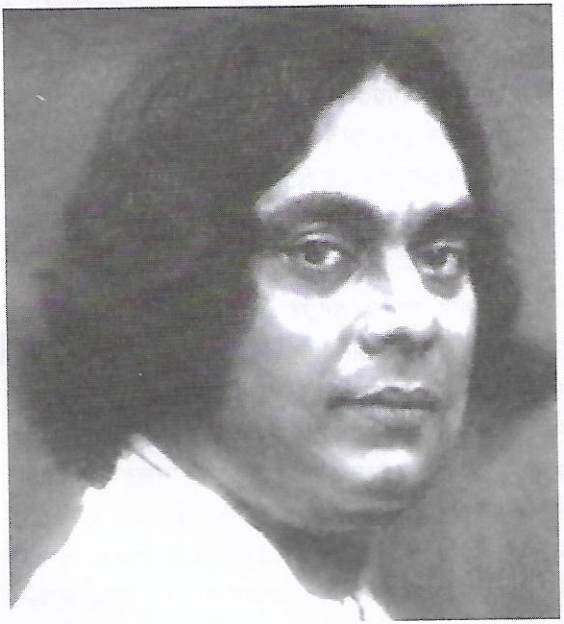

গানের প্রমিত স্বরলিপি প্রকাশের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকার কথা জানলাম। তিনি একজন বিখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং নজরুল ইন্সটিটিউটের একজন সিনিয়র প্রশিক্ষক। এই সাক্ষাতকারেই তিনি উল্লেখ করেন, "যাহা নাই নজরুলে, তাহা নাই সঙ্গীতে।"

আমার মনে হল, কী দূর্দান্ত একটি অভিব্যক্তি! আলবৎ অত্যন্ত বড় একটি দাবি; একটি কর্তৃত্বব্যঞ্জক দাবি। অবশ্যই এখানে সঙ্গীত অর্থে শুধু বাংলা সঙ্গীতই বোঝান হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে "যাহা নাই নজরুলে, তাহা নাই সঙ্গীতে"? শুধু যে আমিই অবাক হচ্ছি আর সমগ্র বিদগ্ধ সমাজ এ দাবি মেনে নিচ্ছেন,

তাই বা ভাবি কি করে? প্রকৃতপক্ষে আমার অবাক হওয়ারইত কোন অধিকার নাই নজরুল ব্রহ্মাণ্ডে একজন ক্ষুদ্র শ্রোতা হওয়া ছাড়া আমার কোনো ভূমিকা নাই। কিন্তু তারপরেও, ছোটবেলা থেকে অদ্যাবধি নজরুল এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রভাব মানষীকতায় যে ছাপ এঁকেছে, তা সহজে উপেক্ষণীয় নয়। আর এই প্রভাব শুধু সঙ্গীত নয়, বরং সাহিত্যে থেকে আরো অনেকগুণ বেশী। আমার বিজ্ঞানী কর্মজীবনেও সাহিত্যের প্রভাব কিছুটা থেকে যায়। কাজেই, "যাহা নাই নজরুলে, তাহা নাই সঙ্গীতে," এই অভিব্যক্তিটি আলোড়িত করে। ভাবি, এতে আমাদের গর্বিত হওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু তার আগে একটি করণীয় হল ব্যাপারটি যাচাই করে দেখা। কারণ, সেই যে ইংরেজিতে বলে, 'Bigger the claim, bigger the burden of proof.' সুতরাং, মৌল ধাঁচের দাবি হিসাবে এটিও প্রমাণভার বহন করে বৈকি।

কিন্তু আমার নিজের দৌড় এখানেই শেষ। আমার পেশাবৃত্তে আমার নিজেরও কিছু মৌলিক দাবি আছে। সেকারণেই বোধকরি সালাউদ্দীন আহমেদ এর নজরুলকে নিয়ে এই মৌলিক ধাঁচের দাবিটি আমাকে আলোড়িত করে। তবে বিজ্ঞানের এবং বিশেষ করে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে কোন দাবিকে সহজেই সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়। মূলত, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সহজাতভাবেই প্রমাণ স্বাপেক্ষ। কোন একটি প্রযুক্তির ব্যবহার উপযোগীতা সহজেই প্রমাণ করে সেটি গ্রহণযোগ্য কিনা। সাহিত্য বা ললিতকলামূলক বিষয়গুলোর সাথে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়গুলোর বোধকরি এটাই সবচেয়ে বড় পার্থক্য। তাই আমার দৌড় যেখানে শেষ সেখানে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় কি? কাজেই সকল নজরুল বিশেষজ্ঞদের কাছে আমার আহ্বান আপনাদের কেউ কেউ যদি দয়া করে এব্যপারে কিছুটা আলোকপাত করেন, তবে এ অধমের কৌতূহল কিছুটা নিবৃত হবে।

মনে পড়ল কিছুদিন আগে ডঃ গুলশান আরা (ওরফে পুষ্প আপা)'র সঙ্গে একটি কথোপকথন। যদিও পেশায় বিজ্ঞানী, তবে উনি একজন খাঁটি নজরুল-উৎসাহী। বিজ্ঞানের পাশাপাশি কাজী নজরুলকে নিয়েও গবেষণা করেন। আমরা বরাবরই শুনে এসেছি "নজরুল গীতি।" কথা প্রসঙ্গে নজরুল গীতি শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই গুলশান আপা আমাকে শুধরে দিলেন; বললেন "নজরুল গীতি" নয়, "নজরুল সঙ্গীত।" কারণ হল, উনি বললেন, 'গীতি' শব্দটির ব্যবহার হয় গানের একটি একক স্টাইল বা ধারা বোঝানোর জন্যে, যেমন লালন গীতি বা পল্লি গীতি। অপর দিকে 'সঙ্গীত' শব্দটির ব্যাপ্তি অনেক বেশী; এটি সঙ্গীতের সামগ্রিকতা বোঝায়। নিজের অজ্ঞতার জন্যে লজ্জিত হয়ে বললাম, এ দুটি পরিভাষার মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম না। সচেতন হওয়ার প্রয়োজনও কখনও আমার হয়নাই। আমি যে দুই একজন নজরুল সচেতন ব্যাক্তিকে চিনি তাঁদের মধ্যে ওনার সঙ্গেই কখনো অনিয়মিত

কিছু আলাপ হয়েছে এ ব্যাপারে। বিজ্ঞানের জগতেও উনি আমার একজন সহ-গবেষক। কাজেই একদিন পুষ্প আপাকেই ফোন দিলাম সালাউদ্দীন আহমেদ এর এই প্রসঙ্গটি আলাপ করার জন্যে।

ওনার কাছে যা জানলাম এবং আরো কিছু খোঁজাখুঁজি করে যা পেলাম তার সার-সংক্ষেপ হল, নজরুলের সঙ্গীত ভূবনে সব রকম ধারা (genre)'র গান রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীতের শব্দ, গীতকবিতা, সুর, রাগ এবং লয় সহ সবরকম শৈলী, ভঙ্গি, রীতি, গায়কী, ইত্যাদি আচ্ছাদিত করেছেন। এ ছাঙা, তিনি সংগীতে অনেক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বিভিন্ন ভাষায় মিশ্রিত সঙ্গীত, নতুন রাগাবলি, ভিন্নধর্মি এবং মিশ্র লয়ের সুর যোগে সঙ্গীত সৃষ্টি করার পরীক্ষা মূলক নতুন মাত্রাও উদ্ভাবন করেছেন। বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী চিন্তাধারাও তাঁর সংগীত মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং প্রদর্শিত হয়েছে। মুর্শিদী থেকে শ্যামাসংগীত কোনটাই তিনি বাদ দেন নাই। মূলত, সাহিত্যেরও সব দিকেই তাঁর অবদান রয়েছে। এককথায়, সঙ্গীত জগতে এমন কিছু নাই যা নজরুল সঙ্গীতে পাওয়া যাবে না। কজেই সালাউদ্দীন আহমেদ এর এই দাবিটি "যাহা নাই নজরুলে, তাহা নাই সঙ্গীতে," সঠিক বলেই আমার মনে হচ্ছে। তবুও আমি আবারও সকল নজরুল বিশেষজ্ঞদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের কেউ কেউ দয়া করে এ ব্যপারে কিছুটা আলোকপাত করবেন।

লেখার লিংক:
https://www.facebook.com/ahsan.huq.39/videos/1099793246866592/
যোগাযোগঃ anis@anisrahman.org

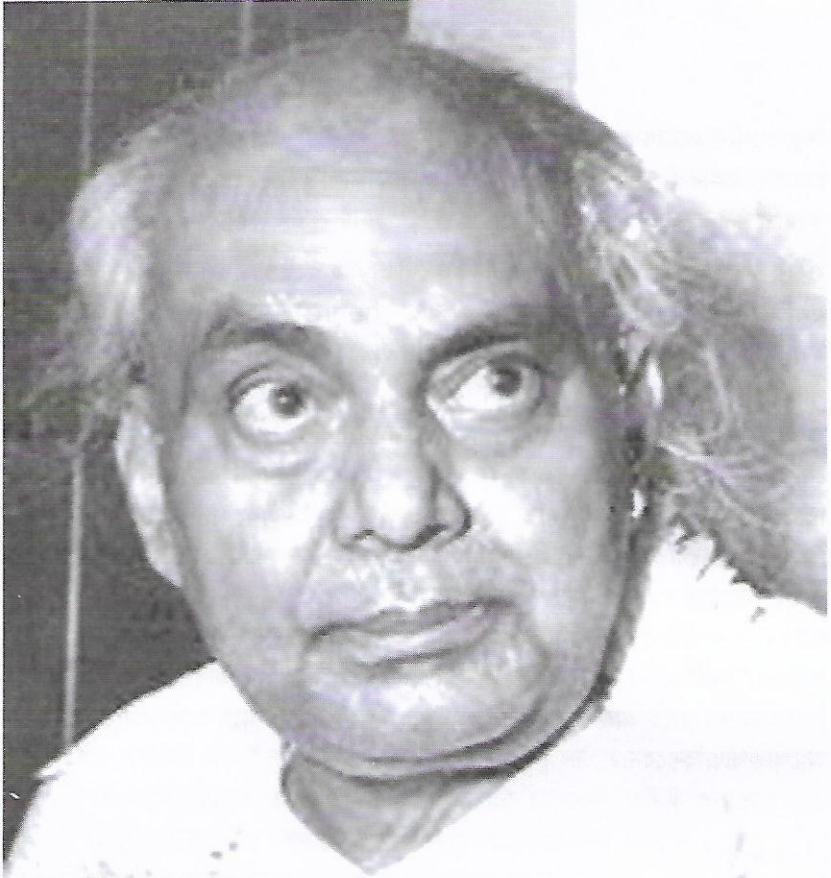

কাজী নজরুল ইসলামের অভিভাষণ

কাজী নজরুল ইসলাম কেবল একজন শ্রেষ্ঠতম কবি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন এককথায় মানবজাতির অন্যতম ত্রাণকর্তা। মানুষের জন্য বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে এবং মানবজীবনকে সার্থক করে তুলতে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে গেছেন। তারই অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর অভিভাষণ, ভাষণ, প্রতিভাষণ এবং বক্তৃতা। উল্লেখ্য তিনি কবি পরিচিতির বাইরে অনেক পরিচয়ে পরিচিত যার মধ্যে অন্যতম হল তাঁর রাজনৈতিক সত্তা ও সমাজ-চিন্তা। কাব্য-সাহিত্যের মতো এক্ষেত্রেও তিনি এমন মাইলফলক স্থাপন করে গেছেন যা অকল্পনীয়, অচিন্ত্যনীয়। তিনি ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার ঘোষকভ ১৯২২ সালের ১৩ অক্টোবর তাঁর সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক ধূমকেতু পত্রিকায় তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লিখিত দাবী উত্থাপন করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। সকল শ্রেণির সকল মানুষকে জাগিয়ে তুলতে তিনি বিভিন্ন এলাকা চষে বেড়িয়ে সভা-সমাবেশ করেন।

এ পর্যায়ে কবির কয়েকটি অভিভাষণ, প্রতিভাষণ, ভাষণ উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

স্থান: নাট্যভবন, সিরাজগঞ্জ

তারিখ: ৫ ও ৬ নভেম্বর ১৯৩২

উপলক্ষ্য: বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলন।

সভাপতি: কাজী নজরুল ইসলাম

আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ!

আপনারা কি ভাবিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে আপনাদের সভাপতি নির্বাচন করিয়াছেন, জানি না। দেশের জাতির ঘনঘোর-ঘেরা দুর্দিনে দেশের জাতির শক্তি-মজ্জা-প্রাণস্বরূপ তরুণদের যাত্রাপথের দিশারি হইবার স্পর্ধা বা যোগ্যতা আমার কোনোদিন ছিল না, আজো নাই। আমি দেশকর্মী-দেশনেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ কোনো স্বদেশপ্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগ-স্বীকারের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে হয়তো আমি তাহাদের কাছে খর্ব pigmy বলিয়া অনুমিত হইব। তবু দেশের জন্য অন্তত এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না পারিলেও অমঙ্গল চিন্তা কোনদিন করি নাই, যাহারা দেশের কাজ করেন তাহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই। রাজ-লাঞ্ছনার চন্দন-তিলক কোনোদিন আমারও ললাটে ধারণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আজ মুছিয়া গিয়াছে।

আজ তাহা লইয়া গৌরব করিবার অধিকার নাই।

আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাহাদেরই দলে যাহারা কর্মী নন-ধ্যানী। যাঁহারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, কর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ; কিন্তু সেই মহৎ হইবার প্রেরণা যাহারা জোগান, তাঁহারা মহৎ যদি না-ই হন অন্তত ক্ষুদ্র নন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির-ধারার মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষ্যে। আমি কবি। বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করায়। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স-ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ম চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আর গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান। সে গান করে আপনার মনের আনন্দে, – যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা-মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজো আমার শেষ হই নাই, কাজেই আমি যে গান গাই তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার

আনিয়া থাকে তাহা আমার অগোচের। যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়তো তাহার শক্তির সম্বন্ধে আজো লা-ওয়াকিফ।–

আমি বক্তাও নহি। আমি কম-বক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী– বখতিয়ার খিলজি, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুত বেগে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমরা বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মতো অবিরল ধারায়। আমাদের–কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মতো। ছন্দের দু-কূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধীরয়া সে সঙ্গীতগুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা-ভাগীরথীর মতো খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের–তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে–যৌবনকে– আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। সাথে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি। জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ-প্রভাতে তেমনি সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগান গহিয়াছি। তরুণ অরুণদের মতোই যে তারুণ্য তিমিরবিদারী সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবনসূর্য যথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমিরকুন্তলা নিশীথিনীর সেই তো লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের এই মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়–আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেউ দলপতি নাই; আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া সর্বপ্রধান অভাব অনুভব করিতেছি আমাদের মহানুভব নেতা– বাংলার তরুণ মুসলিমের সর্বপ্রথম অগ্রদূত তারুণ্যের নিশানবরদার মওলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেবের। সিরাজগঞ্জের শিরাজীর সাথে বাংলার শিরাজ, বাংলার প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। যাঁহার অনল-প্রবাহ-সম বাণীর গৈরিক নিঃস্রাব জ্বালাময়ী ধারা মেঘ-নিরন্ধ্র গগনে অপরিমাণ জ্যোতি সঞ্চার করিয়াছিল, নিদ্রাতুরা বঙ্গদেশ উন্মাদ আবেগ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, 'অনল প্রবাহের ' সেই অমর কবির কণ্ঠস্বর বাণীকুঞ্জে

আর শুনিতে পাইব না। বেহেশতের বুলবুলি বেহেশতে উড়িয়া গিয়াছে। জাতির কওমের দেশের যে মহা ক্ষতি হইয়াছে, আমি শুধু তাহার কথাই বলিতেছি না, আমি বলিতেছি আমার একার বেদনার ক্ষতির কাহিনী। আমি তখন প্রথম কাব্যকাননে ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়াছি-ফিঙে বায়স বাজপাখির ভয়ে ভিরু পাখির মতো কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিবারও দুঃসাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই, নখচঞ্চুর আঘাতও যে না খাইয়াছি এমন নয়– এমনি ভীতির দুর্দিনে মানি–ওর্ডারে আমার নামে দশটি টাকা আসিয়া হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখা: 'তোমার লেখা পড়িয়া খুশি হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।' চোখের জলে স্নেহসুধা– সিক্ত ঐ কয় পংক্তি লেখা বারে বারে পড়িলাম; টাকা দশটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলাম। তখনো আমি তাঁহাকে দেখি নাই। কাঙাল ভক্তের মতো দূর হইতেই তাঁহার লেখা পড়িয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি, শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি। সেইদিন প্রথম মানসনেত্রে কবির স্নেহ-উজ্জ্বল মূর্তি মনে মনে রচনা করিলাম, গলায় পায়ে ফুলের মালা পরাইলাম। তাহার পর ফরিদপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে তাঁহার জ্যোতিবিমণ্ডিত মূর্তি দেখিলাম। দুই হাতে তাঁহার পায়ের তলার ধূলি কুড়াইয়া মাথায় মুখে মাখিলাম। তিনি আমায় একেবারে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন, নিজে হাতে করিয়া মিষ্টি খাওইয়া দিতে লাগিলেন। যেন বহুকাল পরে পিতা তাহার হারানো পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছে। আজ সিরাজগঞ্জে আসিয়া বাংলার সেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মনস্বী দেশপ্রেমিকের কথাই বারে বারে মনে হইতেছে। এ যেন হজ্জ করিতে আসিয়া কাবা-শরিফ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহার রুহ মোবারক হয়তো আজ এই সভায় আমাদের ঘিরিয়া ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহার রুহ মোবারক্ হয়তো আজ এই সভায় আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহারই প্রেরণায় হয়তো আজ আমরা তরুণেরা এই যৌবনের আরাফাত ময়দানে আসিয়া মিলিত হইয়াছি। আজ তাঁহার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে শ্রদ্ধা, তসলিম নিবেদন করিতেছি, তাঁহার দোয়া ভিক্ষা করিতেছি।

আপনারা যে অপূর্ব অভিনন্দন আমায় দিয়াছেন, তাহার ভারে আমার শির নত হইয়া গিয়াছে, আমার অন্তরের ঘট আপনাদের প্রীতির সলিলে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। সেই পূর্ণঘটে আর শ্রদ্ধা প্রতিনিবেদনের ভাষা ফুটিতেছে না। আমার পরিপূর্ণ অন্তরের বাকহীন শ্রদ্ধা-প্রীতি-সালাম আপনারা গ্রহণ করুন। আমি উপদেশের শিলাবৃষ্টি করিতে আসি নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে যাহা না বলিলে নয়, শুধূ সেইটুকু বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

(সূত্র: নজরুল-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড)

******

বার্ধক্য ও যৌবন

আমি সর্বপ্রথমে বলতে চাই, আমাদের এই তরুণ মুসলিম সম্মেলনের কোনো সার্থকতা নাই যদি আমরা আমাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া বার্ধক্যের বিরুদ্ধে, জরার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করিতে না পারি। বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নব মানবের অভিনব জয়যাত্রার পথে শুধু বোঝা নয়– বিঘ্ন; শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দে মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়। যাহারা অটল– সংস্কারের পাষাণ স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে। আলোকপিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতিজ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার–বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি– যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি–যাঁহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহার যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নিমের্ঘ আষাঢ়-মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অতল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-জগলুল-সানইয়াত-লেলিনের শক্তিতে। যৌবন দেখিয়াছি তাহদের মাঝে- যাহারা বৈমানিক-রূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারক- রূপে নব পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া সালিলসমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, পবনগতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়নমণি নিভিয়া যায়- যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি– শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ-বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রুগীর শয্যাপার্শ্বে যখন রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া, ভিখারি সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশার বুকে আশা জাগায়।

ইহাই যৌবন, এই ধর্ম যাহাদের– তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ-কাল জাতি ধর্মের সীমার ঊর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা– মুসলিম তরুণেরা যেন অকুণ্ঠিতচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি: ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরিদ যৌবনের। এই জাতি–ধর্ম কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে

যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা, মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের, সকল ধর্মের সকল লোকে সমান শ্রদ্ধা করে।

পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম; ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই। খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মুনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশতি চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারির মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব, ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

গোঁড়ামি ও কুসংস্কার

আমাদের বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলামানের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যেসব মওলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো-জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষৎদর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন– বেনো-জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমির আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মওলানা মৌলবি সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাকেও চক্ষু-কর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের, জাতির ধর্মের কী অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মতো জ্ঞান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষমা করা যায়। ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই 'মনে মনে শাহ ফরিদ, বগল-মে ইট।' ইহাদের নীতি 'মুর্দা দোজখ-মে যায় য়্যা বেহেশত-মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি-সেকাম।'

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।'– নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আরো লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের ফতুয়া-ভরা ফতোয়া! বিবি তালাক ও কুফরির ফতোয়া তো ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরিবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে তো সে তরুণ! ইহাদের হাতের 'আশা' বা যষ্টি মাঝে মাঝে আজদাহা রূপ পরিগ্রহ করিয়া তরুণ মুসলিমদের গ্রাস করিতে আসিবে সত্য, কিন্তু এই 'আশা' দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলে চলিবে না। এই ঘরোয়া-যুদ্ধ- ভাইয়ের সহিত আত্মীয়ের সহিত যুদ্ধই-সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক। তবু উপায় নাই। যত বড় আত্মীয়ই হোক, তাহার যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইলে তাহাকে অন্যত্র না সরাইয়া উপায় নাই। যে হাত বাঘে চিবাইয়া খাইয়াছে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রাণরক্ষার উপায় নাই। অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান দাড়ি- টুপি দিয়া মুসলামন মাপিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর

আর সব দেশের মুসলামনদের কাছে আজ আমরা অন্তত পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। যাহারা বলেন, 'দিন তো চলিয়া যাইতেছে, পথ তো চলিতেছি,' তাহাদের বলি ট্রেন মোটর এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়িতে শুইয়া দুই ঘণ্টায় এক মাইল হিসাবে গদাইলস্করি চালে চলিবার দিন আর নাই। যাহারা আগে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সঙ্গ লইবার জন্য যদি আমাদের একটু অতিমাত্রায় দৌড়াইতে হয় এবং তাহার জন্য পায়জামা হাঁটুর কাছে তুলিতে হয়, তাই না হয় তুলিলাম। ঐ টুকুতেই কি আমার ঈমান বরবাদ হইয়া গেল? ইসলামই যদি গেল, মুসলিম যদি গেল, তবে ঈমান থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যাক আর শত্রু বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। তবে ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্তত বাপের বাড়িও চলিয়া যায় নাই এবং কুফরি ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ 'শুদ্ধি' হইয়া যান নাই।

অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা

আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাংলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজুবুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষাপোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো-বায়ুর অভাবে। এই সব যক্ষ্মারোগগ্রস্থ জননীর পেটে স্বাস্থ্যসুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদিরও এই সব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে। আমরা ইসলামি সেই অনুশাসনগুলির প্রতি জোর দিয়া থাকি, যাহাতে পয়সা খরচ হইবার ভয় নাই।

কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের যে অভাব, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না- সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে-নারী।

বৃদ্ধদের আয়ুর পুঁজি তো ফুরাইয়া আসিল, এখন আমাদের– তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চিরবন্দিনী মাতা- ভগ্নিদের উদ্ধারসাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখি দুধ-ছোলা খাইয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে, সেও উড়িতে পারে। বাহিরে তাহারই স্বজাতি

পাখিকে উড়িতে দেখিয়া অন্য কোনো জীব বলিয়া ভ্রম হয়। এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো– বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মতো হীনবীর্য সন্তানের জন্ম।

শুধু কি ইহাই? আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা, তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বাহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বতপ্রমাণ বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষেধের দুস্তর পাথার! এইসব লঙ্ঘন করিয়া, অতিক্রম করিয়া যাইবার দুঃসাহসিকতার যাহাদের-তাহারা তরুণ।

সঙ্ঘ-একনিষ্ঠতা

ইহাদের জন্য চাই আমাদের একাগ্রতা, একনিষ্ঠ সাধনা, চাই সঙ্ঘ। আজ আমরা, বাংলার মুসলিম তরুণেরা যূথভ্রষ্ট। আমাদের সঙ্ঘ নাই, সাধনা নাই, তাই সিদ্ধিও নাই। আমাদেরই চারিপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের দেখিতেছি-কী অপূর্ব তাহাদের ঐক্য, ত্যাগ, সাধনা। তাহারা সকলে যেন এক দেহ, এক প্রাণ। সকল বৈষম্য বিরোধের ঊর্ধ্বে তাহারা তাহাদের যে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। জগতের যে কোনো যুব-আন্দোলনের সঙ্গে তাহারা আজ চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে কত বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। ইহারা পিতা-মাতার স্নেহ, ভাই-ভগ্নির প্রীতি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের ভালোবাসা, প্রিয়ার বাহুবন্ধন, গৃহের সুখ–শান্তি, ঐশ্বর্যের বিলাস, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ, সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে জাতির জন্য, দেশের জন্য, মানবের কল্যাণের জন্য। এই তরুণ বীরসন্ন্যাসীর দল আছে বলিয়াই আজো আমরা দিনের আলোতে মুখ দেখিতে পাইতেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ইহারা নচিকেতার মতো প্রশ্ন করে, মৃত্যুর বজ্রমুষ্ঠি হইতে জীবনের সঞ্চয় ছিনাইয়া আনে। এই বনচারী বীরাচারীর দলই দেশের যৌবনে ঘুণ ধরিতে দেয় নাই। ... আমাদের মতো ইহাদের স্কন্ধে চাকুরির দৈত্য সিন্দাবাদের মতো চাপিয়া বসে নাই। ইহারাই সত্যকার আজাদ, বাঁধনহারা। সকল বন্ধন সকল মায়াকে অস্বীকার করিয়া তবে আজ ইহারা এত বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইউনিভার্সিটির কত উজ্জ্বলতম রত্ন– যাহারা আজ অনায়াসে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার প্রফেসর হইয়া নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করিত, তাহারা রাস্তায় প্রাণ ফিরি করিয়া ফিরিতেছে। ইহারা আছে বলিয়াই তো মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জাতি আজো টিকিয়া আছে। দীপশলাকার মতো ইহারা নিজেদের আয়ু ক্ষয় করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রাণপ্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিতেছে।... আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরি অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টের ' মতো আমরা ঐ চাকুরির দিকে তীর্থের কাকের মতো হা করিয়া চাহিয়া আছি। বিএ, এমএ, পাশ করিয়া কিছু যদি না হই-অন্তত সাবরেজিষ্টার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্নে যাহাদের গতি-তাহাদের কি আর মুক্তি আছে? এই ভূত ছাড়িয়া না

গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। এই ভূতকে ছাড়াইবার ওঝা আপনারা যুবকের দল। আমাদেরই প্রতিবেশী তরুণ শহিদদের আদর্শ যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের স্থান সভ্য জগতের কোথাও নাই। চাকুরির মোহ, পদবির নেশা, টাইটেলের বা টাই ও টেলের মায়া যদি বিসর্জন না করিতে পারি, তবে আমাদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত।

কোথায় আছে সেই শহিদদের দল? বাহির হইয়া আইস আজ এই মুক্ত আলোকে, উদার আকাশের নীল চন্দ্রাতপতলে। তোমাদের অস্থি-মজ্জা প্রাণ-দেহ, তোমাদের সঞ্চিত জ্ঞান, অর্জিত ধন-রত্নের উপর প্রতিষ্ঠা হইবে আমাদের সঙ্ঘের- তরুণ সঙ্ঘের। সকল লাভ-লোভ-যশ-খ্যাতিকে পদদলিত করিয়া মুসাফিরের বেশে ভিক্ষুকের ঝুলি লইয়া যে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে– এ সাধনা তাহারই, এ শহিদি দরজা শুধু তাহারই।

সঙ্গীত শিল্প

আমাদের লক্ষ্য হইবে এক, কিন্তু পথ হইবে বহুমুখী। যে দুর্ধর্ষ, সে কালবৈশাখীর কেতন উড়াইয়া অসম্ভবের অভিযানে যাত্রা করুক; যে বীর তাহার জন্য রহিয়াছে সংগ্রামক্ষেত্র; যে কর্মী তাহার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে কর্মের বিপুল উপত্যকা; কিন্তু যে ধ্যানী, যে সুন্দরের পূজারী, সে কল্পপাখায় ভর করিয়া উড়িয়া যাক স্বপ্নলোকে; উদার নিঃসীম নীল নভে। সেই স্বপ্নপুরী হইতে সে যে স্বপনকুমারীকে-রূপকুমারীকে জয় করিয়া আনিবে তাহার লাবণীতে আমাদের কর্মক্লান্ত ক্ষণগুলি স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে । যে গাহিতে জানে, গানের পাখি যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিব দূর-বিথার বনানীর কোলে- আমাদেরই আশেপাশে থাকিয়া আমাদের অবসাদক্লিষ্ট মুহূর্তকে সে গানে গানে ভরিয়া তুলিবে, প্রাণে নবপ্রেরণার সঞ্চার করিবে। ইহারা আমাদের সুন্দর সাথী। বাড়ির উঠানের ফুলে ফুলে ফুল্ল লতাটির পানে চাহিয়া যেমন রৌদ্র-দগ্ধ চক্ষু জুড়াইয়া লই, তেমনি করিয়া ইহাদের কবিতায় গানে ছবিতে আমরা আমাদের বুভুক্ষু অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইব, অবসাদ ভুলিব।

বিধি-নিষেধের বাধা আমরা মানিব না। গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখিকে কোন অধিকারে গলাটিপিয়া মারিতে যাইব? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টিকে হেরিয়া কুফরির ফতোয়া দিবে? এই খোদার উপর খোদকারি আর যাহারা করে করুক, আমরা করিব না।

পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেই সকল প্রদেশের আজো যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী– কি কণ্ঠসঙ্গীতে, কি যন্ত্রসঙ্গীতে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

অথচ সে দেশের মৌলবি মওলানা সাহেবান আমাদের দেশের মৌলবি সাহেবানদের অপেক্ষাও জবরদস্ত। তাঁহারা ঐসব গুণীদের অপমান বা সমাজচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। বরং তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করেন বলিয়াও জানি। সঙ্গীত শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের

সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়।

আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এইসবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙালি মুসলমানদের দান বলিয়া কোনো কিছু থাকিবে না। পশুর মতো সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কী, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়- শ্রেষ্ঠ।

হিন্দু মুসলমান ঐক্য

যৌবনের ধর্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তাহার প্রসার বিশাল, তাহার গতিবেগ বিপুল। ধর্মের গণ্ডী ও প্রাচীরে যৌবন অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। যে ধর্মে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় তাহার প্রসারতা। এইখানেই যৌবনের গর্ব ,মহত্ত্ব। নদী পর্বতে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সে কি পর্বতের চারিপাশেই জলধারার অর্ঘ্য বহিয়া চলিবে? সে কি পর্বত-নিম্নের সমতলভূমি করুণা-সিঞ্চিত করিয়া সাগর-অভিযানে যাইবে না? যে না যায়, সে নদী নয়, সে খাল, ডোবা কিম্বা খুব জোরে ঝর্ণা। আমার ধর্মের শিখর হইতে নামিয়া আমার প্রাণধারা যদি আমারই দেশের উপত্যকা ফুল-ফসলে ভরিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে আমার ধর্ম ক্ষুদ্র, আমার প্রাণ স্বল্পপরিসর। ধর্ম লইয়া বৃদ্ধেরা, প্রৌঢ়েরা কলহ করে করুক, আমরা যেন কুৎসিত কলহে লিপ্ত না হই। আমার ধর্ম যেন অন্য ধর্মকে আঘাত না করে, অন্যের মর্মবেদনার সৃষ্টি না করে।

এক দেশের জলে-বায়ুতে ফলে - ফসলে, এক মায়ের স্তন্যে পুষ্ট হিন্দু-মুসলমানে যে কদর্য বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সভ্যজগতে আমাদের সভ্য বলিয়া পরিচয় দিবার আর মুখ নাই। জননায়ক হইবার নেশায় হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ আজ জনসাধারণকে কেবলই ধর্মের নামে উগ্র মদ পান করাইয়া করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিয়াছেন। এই অশিক্ষিত হতভাগ্যদের জীবন হইয়া উঠিয়াছে ইহাদের হাতের ক্রীড়নক। ইহাদের অশিক্ষা ও ধর্মান্ধতাই হইয়াছে ঐসব সাম্প্রদায়িক নেতাদের হাতের অস্ত্র। যখন যেমন ইচ্ছা তখন তেমনি করিয়া ইহাদের ক্ষেপাইতেছেন। আমার মনে হয় কাউন্সিল-এসেমব্লি প্রভৃতির বালাই না থাকিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধের এমন ভীষণ কদর্য মূর্তি দেখিতাম না। আজ দেখি তিনিই হিন্দুদের নেতা যিনি সকাবাব কারণ– সলিল পান না করিয়া মায়ের নাম লইতে পারেন না। মুসলমানদের আজ তিনিই হঠাৎ নেতা হইয়া উঠিয়াছেন– যিনি স হ্যাম হুইস্কি পান না করিয়া ইসলামের মঙ্গল চিন্তা করিতে পারেন না। ইহাদের অর্থ আছে, তাই যথেষ্ট ভাড়াটিয়া মোল্লা মৌলবি পণ্ডিত

পুরুত যোগাড় করিয়া কাগজে কাগজে ডঙ্কা পিটাইয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য ওকালতি করিতে পারেন। খোদার বা ভগবানের তো কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই না। যখন মড়ক আসে, হিন্দু-মুসলমান সমানে মরিতে থাকে, আবার যখন তাঁহার আশীষধারা বৃষ্টিরূপে ঝরিতে থাকে, তখন হিন্দু-মুসলমান সকলের ঘরে সকলের মাঠে সমান ধারে বর্ষিত হয়। আমরা কেন তবে খোদার উপর খোদকারি করিতে যাই? খোদার রাজ্য খোদা চালাইবেন, তিনি যদি ইচ্ছা না করিবেন তাহা হইলে অমুসলমান কেহ একদিনও বাঁচিতে পারিত না। সব বুঝি, সব জানি, তবু ধর্মের মুখোস পরিয়া স্বার্থের দৈত্য যখন মাতলামি আরম্ভ করে-তখন আমরাও সেই দলে ভিড়িয়া যাই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, নির্মল-বুদ্ধি মহাপুরুষদের মস্তিষ্কও তখন মায়াচ্ছন্ন হইয়া যায় দেখিয়াছি। সর্বাপ্রেক্ষা পরিতাপের বিষয়– এই কুৎসিত সংগ্রামে লিপ্ত হয় বৃদ্ধের প্ররোচনায় তরুণেরা। আপনারা এই কদর্যতার বহু ঊর্ধ্বে, আপনাদের বুদ্ধি সংকীর্ণতা- মুক্ত, ইহাই হউক আপনাদের ধ্যান-মন্ত্র। ইসলাম ধর্ম কোনো অন্য ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করিতে আদেশ দেয় নাই। ইসলামের মূল নীতি সহনশীলতা, passive resistance, ইমাম হাসান ও হোসেন তাহার চরম দৃষ্টান্ত। আজ আমাদের পরমত- সহনশীলতার অভাবে, আমাদের অশিক্ষিত প্রচারকদের প্রভাবে আমাদের ধর্ম বিকৃতির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, আমাদের তরুণদের ঔদার্যে, ক্ষমায় আমাদের সেই পূর্বগৌরব ফিরিয়া আসিবে। মানুষকে মানুষের সম্মান-হোক সে যে কোনো জাতি, যে কোনো ধর্ম, যে কোনো সম্প্রদায়ের-দিতে যদি না পারেন, তবে বৃথাই আপনি মুসলিম কোনো ধর্ম, যে কোনো সম্প্রদায়ের-দিতে যদি না পারেন, তবে বৃথাই আপনি মুসলিম বলিয়া, তরুণ বলিয়া ফখর করেন।

শেষ কথা

আমার অভিভাষণ হয়তো অতিভাষণ হইতে চলিল। আমার শেষ কথা- আমরা যৌবনের পূজারী, নব-নব সম্ভাবনার অগ্রদূত, নব-নবীনের নিশানবরদার। আমরা বিশ্বের সর্বাগ্রে চলমান জাতির সহিত পা মিলাইয়া চলিব। ইহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে যে, বিরোধ আমাদের শুধু তাহার সাথেই। ঝঞ্ঝার নূপুর পরিয়া নৃত্যায়মান তুফানের মতো আমরা বহিয়া যাইব। যাহা থাকিবার তাহা থাকিবে, যাহা ভাঙিবার তাহা আমাদের চরণাঘাতে ভাঙিয়া পড়িবেই। দুর্যোগরাতের নীরন্ধ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হউক আমাদের প্রাণ-প্রদীপ্তি! সকল বাধা-নিষেধের শিখরদেশে স্থাপিত আমাদের উদ্ধত বিজয়-পতাকা। প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা যেন সকল সঙ্কীর্ণতাকে পায়ে দলিয়া চলিয়া যাইতে পারি।

আমরা চাই সিদ্দিকের সাচ্চাই, ওমরের শৌর্য ও মহানুভবতা, আলির জুলফিকার, হাসান-হোসেনের ত্যাগ ও সহনশীলতা। আমরা চাই খালেদ-মূসা-তারেকের তরবারি, বেলালের প্রেম। এইসব গুণ যদি আমরা অর্জন করিতে পারি, তবে জগতে যাহারা আজ অপরাজেয় তাহাদের সহিত আমাদের নামও সসম্মানে উচ্চারিত হইবে।

প্রতি - নমস্কার

স্থান: চট্টগ্রাম

সময়: ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে

উপলক্ষ্য: চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে কবি এই প্রতিভাষণ প্রদান করেন।

ওগো বুলবুলিস্তানের নব বৈতালিক দল!

তোমরা আমার সানুরাগ প্রতি-নমস্কার গ্রহণ কর।

তরবারি গ্রহণ করতে উচ্চশিরে- উদ্ধত হস্ত তুলে, মালা গ্রহণ করতে হয় উচ্চ শির অবনমিত করে- উদ্ধত হস্ত যুক্ত করে ললাটে ঠেকিয়ে।

তোমাদের যুক্ত করের অঞ্জলির বিনিময়ে আমার যুক্ত করের রিক্ত নমস্কার গ্রহণ কর।

তোমাদের এই দানের বিনিময়ে আমি যেন আমার গানের পাত্র পূর্ণ করে তোমাদের ভেট দিতে পারি।

তোমরা নতুন বাগিচার নতুন বুলবুলি, তোমরা চাও শুধু রসের মধু, রূপের কুসুম, প্রাণের গুলবাগিচা।... তত্ত্বকথার ঢিল ছুঁড়ে আমি তোমাদের গীতলোকে, ধেয়ান-কুঞ্জে উৎপাতের সৃষ্টি করব না। তোমাদের রূপের হাটে রসের বাজারে আমি করে যাব আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের স্তবগান।

এই ক্ষণিকের অতিথি গানের পাখিকে তোমরা যে ফুলের সওগাত দিলে-ওগো বাহার-গুলিস্তানের উদাসী শিশুর দিল, তার প্রতুত্তরে আমার একমাত্র সম্বল গান ছাড়া তো দেবার কিছুই নেই। আমার গানে তোমাদের বনের কুসুম মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, সেই তো আমার শ্রেষ্ঠ অভিবন্দনা।

সেদিন আমার কণ্ঠে হলাহলের তিক্ততা উঠেছিল, সেই সুরাসুরে সাগরমন্থনের প্রখর মধ্যাহ্নেও তোমরা নির্ভীক শিশুর দল আমার নীলকণ্ঠের কণ্ঠহার রচনা করছিলে। আবার আজ যখন মৃতের শ্মশানচারী আমি অমৃতের সুরলোকে যাত্রা করেছি, সেদিনও তোমরা এসেছ তোমাদের অর্ঘ্যের নির্মাল্য নিয়ে।

হে ভয়ে-নির্ভীক আনন্দে -শান্ত দেবশিশুর দল, তোমরা আমার প্রণম্য। আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।

যে জবাকুসুম–সঙ্কাশ নবারুণের আদি উদয় দেখে বনের তাপস-বালকেরা স্তবগানে শান্ত আকাশকে মুখর করে তুলেছিল, সেই তাপস-কুমারদের আমি তোমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করছি। আমি গানের পাখি, অনাগত অরুণোদয়ের স্পন্দন আমার কণ্ঠে গান হয়ে ফুটে উঠেছে- সরাইখানার ঘুমন্ত মুসাফির, জাগো। সূর্যোদয়ের আর দেরি নেই, বন্ধু জাগো,

আমার গান শুনে এই তন্দ্রাহত আলোক-বঞ্চিত মুসাফিরদের আগে জেগে ওঠ তোমর জীবনশিশুর দল। তোমাদের সেই জাগর-চঞ্চল গানই হবে আমার সুন্দরত আমন্ত্রণগাথা।

আমায় সাদর সম্ভাষণ করেছে তোমাদেরই আগে তোমাদেরি গিরি-সিন্ধু-নদী- কান্তা পরিশোভিত পরিস্থান। তোমাদেরি গিরিরাজের কোলের কাছটিতে সর্ষেফুলের আঁচ বিছিয়ে যে উদাসিনী বালিকাকে নদীর ঢেউ খেলানো চুল এলিয়ে বসে থাকতে দেখো আমায় সর্বপ্রথম মৌন অভিনন্দন জানিয়েছে সে।.. তোমাদের কর্ণফুলির তরঙ্গে তরুণী তার ভরা যৌবনের স্বপ্ন বিছিয়ে , কাননের কুন্তল এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে, আমা সর্বপ্রথম আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছে সে-ই তার সাম্পান মাঝির হাতে। ...বুকে বাড়বকু হোমাগ্নি জ্বালিয়ে তোমাদের গিরিবাজ সে নবসৃষ্টির ধ্যানে সমাধিমগ্ন আমায় সর্বা আশীষ জানিয়েছে তাদেরই ঊর্ধ্ববাহু দেওদার শাল পিয়াল শাল্মলী সেগুন। ...তোমাদে বনে বনে ঘুরে ফেরে যে বালিকা বনলক্ষ্মী- তার হলদে পাখি বৌ কথা কও পিক-পাপিয়া নূপুর-কাঁকন বাজিয়ে , গুবাক-তরুর হাতছানি দিয়ে আমায় সবার আগে ডেকেছে সে আলুলায়িতকুন্তলা কপালকুণ্ডলা। তোমাদের উদার আকাশ মেঘের আল্পনা এঁকে আম আসন রচনা করেছে, চণ্ড-বৃষ্টি প্রপাত–ছন্দে তোমাদের আসমানি মেয়েরা আমার শি পুষ্পবৃষ্টি করেছে, তোমাদের জলপ্রপাত নির্ঝরিণী আমার গজল-গানে সুর দিয়েছে তোমাদের সিন্ধু-হিল্লোল আমার রক্তে নতুন দোল দিয়েছে- তার ভাঁটির টানে আমা অতলতলে টেনে নিয়ে গেছে...আমার আর অন্য অভিনন্দনের ছিল না।

আমার জন্য যদি আসনই দাও তোমরা, তবে তা যেন বুকের আসন হয় বন্ধু, সভ কোলাহলের নির্বাসন আমি চাই না।

কোনোদিন তোমাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারব- এ ঔদ্বত্য আমার নেই, সম্বলও নেই আমি যাযাবর কবি, আমায় ঝুলি ভরে যে পাথেয় দিলে তোমরা, তাই যেন আমার ভা পথের সহায় হয়।

বিনিময়ে আমি রেখে গেলাম তোমাদের সিন্ধুতে তোমাদের কর্ণফুলিতে আমার দুই বি অশ্রু। তোমাদের হাতের দানকে চোখের জলে ভিজিয়ে গেলাম।

জীবনে কোনো সাধই তো পূর্ণ হল না; ভবিষ্যতে যে হবে, সে আশাও রাখিনে। তবু এ প্রার্থনাই করে যাই আজ তোমাদের সিন্ধু-বেলায় দাঁড়িয়ে যে, মরতেই যদি হয় তা শেলির মতো তোমাদের এই সিন্ধু-জলেই যেন আমার সে মৃত্যু-দেবতার দর্শন পাই।

বুলবুল
বৈশাখ-আষাঢ়,১৩৪১
(সূত্রঃ নজরুল-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ১৬-১৮)
****

মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা

স্থান: চট্টগ্রাম

সময়: ১৯২৯ খ্রি.

উপলক্ষ্য: চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা

সভাপতি: কাজী নজরুল ইসলাম

আজ আপনাদের কাছে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে আগে মনে হচ্ছে কবির একটা লাইন,-'ঝড় আসে নিমিষের ভুল!' সেদিনের পশ্চিমে-ঝড় যখন এসেছিল বদ্ধ দ্বারের জিঞ্জিরে নাড়া দিতে, সেদিন যখন সে বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে গেয়েছিল–

কারাগারে দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভেতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা।

তখন আপনারা তাকে বরণ করেছিলেন খাঞ্চা-ভরা সওগাত, রেকাবি-ভরা শিরনি দিয়ে, শিরিন নজরের নজরাণ দিয়ে। আপনাদের হাতের ফুলে তার কণ্ঠের নীল বুকের কাঁটা ঢাকা পড়ে গেছিল। আপনাদের শিরোপার ভারে তার শির সেদিন আপনি নুয়ে পড়েছিল। শুধু যে তার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই দিয়ে যেতে পারে নি।

আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণতীর্থ জিয়ারত করতে। সেবারে সে বলেছিল–

খুলব দুয়ার মত্ত বলে,
তোদের বুকের পাষাণ-তলে
বন্দিনী যে ঝর্ণাধারা
মুক্তি দেবো মুক্তি তায়।
হারিয়ে গেছে দোরের চাবি,
তাই কেঁদে কি লোক হাসাবি?
আঘাত হেনে খুলব দুয়ার,
আয় যাবি কে সঙ্গে আয়।
দ্বারের মায়া করে তোরা
বন্দি রবি নিজ কারায়? নাই কো চাবি, হাত আছে তোর,
খুলব দুয়ার তার সে ঘায়।

সে ঝড় আবার এসেছে– হয়তো বা তেমনি নিমেষের ভুলেই। এবার সেই ঝোড়ো হাওয়া

'পুবের হাওয়া' হয়ে। তার রূপ সুর দুই-ই বদলে গেছে। আজ হয়তো সে বলতে চায়–

'ঘা দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান গেয়ে দ্বার খোলাবো।'

সেবার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল ফোটানোর মন্ত্র শিখে।

এমনই হয়। ফাল্গুনের মলয়-সমীর বৈশাখে দেখা দেয় কালবৈশাখী-রূপে, শ্রাবণে সে-ই আসে পুবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভরে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দুলে ওঠে তারই হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।

ফুল ফোটানোই আমার ধর্ম। তরবারি হয়তো আমার হাতে বোঝা, কিন্তু তাই বলে তাকে আমি ফেলেও দেইনি। আমি গোধূলি বেলায় রাখাল ছেলের সাথে বাঁশি বাজাই, ফজরে মুয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলিয়ে আজান দেই, আবার দীপ্ত মধ্যাহ্নে খর তরবার নিয়ে রণভূমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তখন আমার খেলার বাঁশি হয়ে ওঠে যুদ্ধের বিষাণ, রণশিঙ্গা।

সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে-সেই অসুরের জন্য।

কিন্তু কিছু বলবার আগে আমি স্মরণ করি সেই বিরাট পুরুষকে যার কীর্তি শুধু তাঁকে মহিমান্বিত করেনি, আপনাদের চট্টলবাসী মুসলমানদের–তথা বাংলার সারা মুসলিম সমাজকে নর-নারী-নির্বিশেষে মহিমান্বিত করেছে। তিনি আপনাদেরই এবং আমাদেরও পুণ্যশ্লোক মরহুম খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব। শাহজাহানের তাজমহল গড়ে উঠেছিল শুধু মমতাজের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে-তাজমহল সুন্দর। কিন্তু এই আত্মভোলা পুরুষের তাজমহল গড়ে উঠেছে সকল কালের সকল মানুষের বেদনাকে কেন্দ্র করে। এ তাজমহল শুধু beautiful নয় এ sublime মহিমা ময়!

ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে জানবার সুবিধা পাইনি। চাঁদ দেখিনি, কিন্তু সমুদ্রের জোয়ার দেখেছি। জোয়ার শুধু পূর্ণিমার চাঁদই জাগায় না, মৃত্যুর অমাবস্যার অন্তরালে ঢাকা পড়ে যে চাঁদ-সেও জোয়ার জাগায়। তাঁকে দেখিনি কিন্তু তাঁকে অনুভব করেছি এবং আজো করছি আপনাদের জাগরণের মাঝে- আমাদের নারী- জাগরণের উদয়-বেলায়।

এমনি করে এক একটা সর্বভোলা সর্বত্যাগী মানুষ আসে আমাদের মাঝে। আমাদের স্বার্থের কালো চশমা দিয়ে তখন তাঁকে দেখি মলিন করে, তাঁকে বলি, হয় পাগল নয় স্বার্থপর। কোকিল যখন আসে বাগে বাহারের খোশ-খবরি নিয়ে , কর্তব্যপরায়ণ কাক তখন দল বেঁধে তাকে তাড়া করে। তার গানকে তারা মনে করে উৎপাত। অভিমানী কোকিল বসন্ত শেষে উড়ে যায় নতুন বুলবুলিস্তানের সন্ধানে, তখন সারা কানন জুড়ে জাগে বিরাট একটা অভাববোধ, পেয়ে হারানোর তীব্র বেদনা।

পাখি উড়ে যায়-তারপর আসে সেই সুদিন যার আগমনী গান সে গেয়েছিল। তখন সেই

সুদিনের সুন্দর আলোকে স্মরণ করি সেই সকলের-আগেজাগা গানের পাখিকে। কিন্তু পাখি তখন থাকে না কো, থাকে পাখির স্বর।

আমি তাঁরই মতো গানের পাখি-আপনাদের এই স্মরণ -বেলায় আমিও এসেছি তাই তীর্থযাত্রী হয়ে তাঁকেই স্মরণ করতে-যিনি আমাদের বহু আগে জেগেছিলেন। তাঁর পাক কদমে আমার হাজার সালাম।

তিনি আজ আমার সালাম নিবেদনের বহু উর্ধ্বে, বহু দূরে; তবু এ ভরসা রাখি, যে আমার এই অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া ফুল তাঁর চরণ ছুঁয়ে ধন্য হবেই। আমি জানি, এ বিশ্বে কোনো কিছুই নশ্বর নয়, কোনো কিছুই হারায় না কোনোদিন। যে-রূপে যে-লোকেই হোক তিনি আছেন এবং আমার এই ভাসিয়ে দেওয়া সালামি-ফুলও সেই না জানার অকূলে কূল পাবেই পাবে।

আমরা বড় কাউকে যখন হারাই, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি- তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর সাধনাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে। যে বিরাট আত্মার নৈকট্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, তার দুঃখ বহু পরিমাণ ভুলতে পারব, যদি তাঁরই অসমাপ্ত সাধনাকে আমাদের সাধনা বলে গ্রহণ করতে পারি। চট্টলের 'আজিজ নাই, কিন্তু বাংলার আজিজরা - দুলাল ছেলেরা আজো বেঁচে আছে- তাদেরই মধ্যে তাঁকে ফিরে পাব পরিপূর্ণরূপে, এই হোক আপনাদের-এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাধনা! এর চেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই।

তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। তাঁর 'বাহারের' মতো বাহার হয়তো বা থাকতেও পারে, কিন্তু তাঁর 'নাহারে'র মতো নাহার আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।

তিনি সুর ধরিয়ে দিয়ে গেছেন, এখন একে 'সমে' পৌঁছে দেওয়া আপনাদের কাজ। উস্তাদ নেই, শিষ্যরা তো আছেন। একজন উস্তাদের অভাব কি শত শিষ্যেও পূরণ করতে পারবে না?

বন্ধু-বান্ধব অনেকের কাছেই শুনেছি আপনাদের উস্তাদের লক্ষ্য ছিল অসীম, আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল বিরাট।

সাগর যাদের চরণ ধোয়ায়, পর্বতমালা যাদের শিয়রের বিনিদ্র প্রহরী, নদী-নির্ঝরিণী যাদের সেবিকা, অগ্নিগিরি যাদের বুকের ওপর, উচ্ছল জলপ্রপাত যাদের অবিনাশী প্রাণধারা, কানন-কুঞ্জ যাদের শ্রী নিকেতন,বন্য-হিংস্র শার্দুল - সর্প যাদের নিত্য সহচর, তারা সেই মহান পুরুষের বিরাট দায়িত্বকে গ্রহণ করতে ভয় করে একথা আর যে বলে বলুক, আমি বলব না।

আপনাদের শিক্ষা-সমিতিতে এসেছি আমি আর একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। সে হচ্ছে,

আপনাদের সমিতির মারফতে বাংলার সমগ্র মুসলিম সমাজের বিশেষ করে ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে,- আমি যে মহান স্বপ্ন দিবা-রাত্রি ধরে দেখছি, - তা-ই বলে যাওয়া। এ স্বপ্ন যে একা আমারই তা নয়। এই স্বপ্ন বাংলার তরুণ মুসলিমের, প্রবুদ্ধ ভারতের এ স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর নব-নবীনের। আমি চাই, আপনাদের এই পার্বত্য উপত্যকায় যে স্বপ্ন রূপ ধরে উঠুক।

আমি চাই , এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়- দিনে সকলের সাথে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা।

আপনাদের সমিতির উদ্দেশ্য হোক, আদাওতি করে আসন জয় করা নয়-দাওত দিয়ে মনের সিংহাসন অধিকার করা।

আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান- আরফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থ-যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করব না-ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব- এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানেই তুলে ধরেছি এতদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করব। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ লজ্জার পরিসমাপ্তি যেন তারি অতল তলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে!

আমি বলি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো আমাদেরও কালচারের, সভ্যতার, জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন- আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন অঞ্জলির মতো করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে।

প্রকৃতির এই লীলাভূমি সত্যি সত্যিই বুলবুলিস্তানে পরিণত হোক-ইরানের শিরাজের মতো। শত শত সাদি, হাফিজ, খৈয়াম, রুমি, জামি, শমশি-তবরেজ এই শিরাজবাগে-এই বুলবুলিস্তানে জন্মগ্রহণ করুক। সেই দাওতের আমন্ত্রণের গুরুভার আপনার গ্রহণ করুন। আপনার রুদকির মতো আপনাদের বদ্ধ প্রাণধারাকে মুক্তি দিন।

আমি এইরূপ 'কালচারাল সেন্টারের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নানা কারণে। একটি কারণ তার রাজনৈতিক।

পলিটিক্সের নাম শুনে কেউ যেন চমকে উঠবেন না। আমি জানি, আপনাদের এই সমিতি রাজনীতি আলোচনার স্থান নয়, তবু যেটুকু না বললে নয়, আমি শুধু ততটুকুই বলব এবং সেটুকু কারুর কাছেই ভয়াবহ হয়ে উঠবে না। আমি তাই একটু খুলে বলব মাত্র।

ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি- শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে- তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই

প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারুর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ-মজুরদের-(আর, তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি) দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়তো বা এরা যথা পূর্বম তথা পরম্ দরিদ্র মূর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে এ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্পে- সঙ্গীতে সাহিত্যে মুসলমানের বিরাট দানের কথা হয় তারা জানেই না, কিংবা শুনলেও আমাদের কেউ তাদের সামনে তার সত্যকার ইতিহাস ধরে দেখাতে পারে না বলে বিশ্বাস করে না; মনে করে- ও শুধু কাহিনী। হয়ত একদিন ছিল, যখন হিন্দুরা মুসলমানদের অশ্রদ্ধা করত না। তখন রাজভাষা state Language ছিল ফার্সি, কাজেই হিন্দুরাও বাধ্য হয়ে ফার্সি শিখতেন-এখন যেমন আমরা ইংরেজি শিখি। আর ফার্সি জানার ফলে তাঁরা মুসলমানদের বিশ্বসভ্যতায় দানের কথা ভালো করেই জানতেন। কাজেই সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ আসার পূর্ব পর্যন্ত কোন মুসলমান নওয়াব বাদশার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেও সমগ্র মুসলামন জাতি বা ধর্মের উপর বিরূপ হয়ে উঠেননি। শিবাজি প্রতাপ যুদ্ধ করেছিল আওরঙ্গজেব আকবরের বিরুদ্ধে মুসলমান ধর্ম বা ধর্মালম্বীদের বিরুদ্ধে নয়। তখন কার সেই অশ্রদ্ধা ছিল ব্যক্তির বিরুদ্ধে -person এর against এ-গোষ্ঠীর বা সমগ্র জাতটার ওপর একেবারেই নয়।

কিন্তু আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে, আমরা সবচেয়ে কাছের মানুষটিকেই সবচেয়ে কম করে জানি। আমরা ইংরাজের কৃপায়, ইংরাজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যানডিনেভিয়ান, চিন, জাপানি, হনলুলু, গ্রিনউইচের ভাষা জানি, ইতিহাস জানি, তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর, ঘর তারই কোনো খবর রাখিনে বা রাখার চেষ্টাও করিনে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। একেই বলে বোধ হয়, penny wise pound foolish!

হিন্দু, আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না, অথচ আমাদের শাস্ত্র- সভ্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান সব কিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবিদের মতই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দি। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু করে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওদের মুখের বোরকাও খুলছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকা-মুক্ত হল না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের দানের মহিমা। অতএব অন্য ধর্মালম্বীদের আমাদের কোনো কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশ্য আমরাও অনুস্বারের সঙ্গীন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর

হিন্দু তবু কতকটা কিনারা করেছে সে সমস্যার। তারা প্রাদেশিক ভাষায় তাদের সকল কিছু অনুবাদ করে ফেলেছে। সংস্কৃতের সঙ্গীন-উচানো দুর্গ থেকে রূপ-কুমারীকে গোপনে মুক্তিদান করেছে। তার ভবনের আলো আজ ভুবনের হয়ে উঠেছে।

মাতৃভাষায় সে সবের অনুবাদ হয়ে এই ফল হয়েছে যে, অন্তত বাংলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যত পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।

কোনো মুসলমান যদি তার সভ্যতা ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায় তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভালো করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাংলাও ভালো করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি ! কাজেই ন মণ তেলও আসেনা, রাধাও নাচে না। আর যাঁরা ও ভাষা শেখেন, তাঁদের অবস্থা 'পড়ে ফার্সি বেচেতেল।' আর তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালূয়া-রুটির জন্য। কয়জন মওলানা সাহেব আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি-ফার্সির সমুদ্র মন্থন করে অমৃত এনে দিয়েছেন জানি না। সে অমৃত তারা একা পান করেই 'খোদার খাসি' হয়েছেন।

কিন্তু এ খোদার খাসি দিয়ে আর কতদিন চলবে? তাই আপনাদের অনুরোধ করতে এসেছি- এবং আপনাদের মারফতে বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদেরও অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে-যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের কেন্দ্রভূমির যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না। আমাদের next door neighbour এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে, আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামিরও অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে competition হবে সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition—sportsman like competition.

'বুলবুল'
ফাল্গুন, ১৩৪৩
******

স্থান: ফরিদপুর

তারিখ: ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

উপলক্ষ্য: ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনী।

সভাপতি: কাজী নজরুল ইসলাম

বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও

আপনারা আমাকে আপনাদের ফরিদপুর মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ করে যে গৌরব দান করেছেন, তার জন্য আমার প্রাণের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আমি বর্তমানে সাহিত্যের সেবা থেকে, দেশের সেবা থেকে, কওমের খিদমতগারি থেকে অবসর গ্রহণ করে সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগর-দ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছি। সেই সাথীহীন নির্জন দ্বীপ ঘিরে দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটানা জলকল্লোল-সঙ্গীত; আর সেই শব্দায়মান সুর-ঊর্মির মুখরতার মাঝে বসে আছি বন্ধুহীন-একা। এই বিশ্ব জুড়ে যে মহামৌনীর স্তবগান নিঃশব্দ-ঝঙ্কারে রণিত হচ্ছে, যদিও আমি সেই ধ্যানীর মৌন-মহিমার পুজারী, তবু একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমার নির্জনতার বক্ষ জুড়ে শুনেছি অবিরাম বিষাদিত রোদনধ্বনি, শান্তিহীন বিলাপ। মৃত্যুর পরে অশান্ত আত্মা যদি কেঁদে বেড়ায় তার কান্না বুঝি এমনি নীরব, এমনি মর্মন্তুদ। কত বিপুল বিরাট ভিত্তির উপর আমি আমার ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম; কী অপরিণাম আশা, দুর্জয় সাহস নিয়েই না আমি নতুন জাতি নতুন মানুষের কল্পনা করেছিলাম। আমার সেই ভিত্তিকে জানি না কার অভিশাপে ধরণীতল গ্রাস করেছে, সেই স্বপ্নকে নিষ্ঠুর বস্তুর জগত অভাবের সংসার ভেঙে দিয়েছে। পরাজয় স্বীকার আমি আজো করিনি, কিন্তু ধৈর্যের দুর্গম দুর্গে আর কতদিন আত্মরক্ষা করব?

বেশিদিনের কথা নয়, সেদিনও আমার আশা ছিল, এই ছাত্র সমাজকে অগ্রদূত করে নব বিজয়-অভিযানের আমি হব তূর্যবাদক, নকিব, সৃষ্টি করব সুন্দরের জগত-কল্যাণী পৃথ্বী, ধরণীর পঙ্কিল বক্ষ ভেদ করে আনব পবিত্র আব-জমজম ধারা। সে আশা আমার আজও ফললো না। বুঝি মুকুলেই তা পড়ল ধূলায় ঝরে। আমি তাই এতদিন নিজেকে দেশের কাছে, জাতির কাছে মনে করেছি মৃত। কতদিন মনে করেছি আমার জানাজা পড়া হয়ে গেছে। তাই যারা কোলাহল করে আমায় নিতে আসে, মনে হয় তারা নিতে এসেছে আমায় গোরস্থানে- প্রাণের বুলবুলির স্থানে নয়। কত দিক থেকে কত আহবান আসে আজো; যত সাদর আহবান আসে, তত নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলি- ওরে হতভাগ্য, তোর দাফনের আর দেরি কত? কত দিন আর ফাঁকি দিয়ে জয়ের মালা কুড়িয়ে বেড়াবি? কওমের জন্য, জাতির জন্য দেশের জন্য কতটুকু আমি করেচি-তবু তার প্রতিদানে অতি কৃতজ্ঞ জাতি যে শিরোপা আনে, তাতে শির আমার লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়। তাই আপনাদের দাওয়াত পেয়ে যখন ধন্য হলাম, তখন দ্বিধাভরে অসঙ্কোচে তা কবুল

করতে পারিনি। যে ভাগ্যহীন নির্জনতার অন্ধ- কারায় অভাবের শৃঙ্খলে বন্দি, সে কোথায় পাবে মুক্তির বাঁশি? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার অক্ষমতা নিবেদন করেছি আপনাদের কাসেদের কাছে, দূতের কাছে-কিন্তু তাঁরা আমার আর্জি মঞ্জুর করেননি। এক দিন যারা ছিল আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম, আত্মার আত্মীয়, তারা যখন তাদের প্রতি আমার ভালোবাসার দোহাই দিল তখন আর থাকতে পারলাম না। জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত, অবসন্ন, দুঃখ-শোকের শত জিঞ্জিরে বন্দি হয়েও আসতে হল আমাকে আপনাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে। ফরিদপুরের তরুণ ফরিদ দলের নেতৃত্ব করার অধিকার নেই এই সংসারের চিড়িয়াখানায় বন্দি সিংহের-যে সিংহ আজ হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের ট্রেডমার্কের সাথে এক গলাবন্ধে বাঁধা পড়েছে। আমার এক নির্ভীক বন্ধু আমাকে উল্লেখ করে একদিন বলেছিলেন, 'যাকে বিলিতি কুকুরে কামড়েছে তাকে আমাদের মাঝে নিতে ভয় হয়।' সত্যি, ভয় হবারই কথা। তবু কুকুরে কামড়ালে লোকে নাকি ক্ষিপ্ত হয়ে অন্যকে কামড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, আমার কিন্তু সে শক্তিও নেই, আমি হয়ে গেছি বিষ-জর্জরিত নির্জীব!

কিন্তু এ শোনাতে তো আমায় আপনারা আহবান করে আনেননি। আপনারা শামাদানে এনে বসিয়েছেন সেই প্রদীপকে যা একদিন হয়তো বা অত্যুগ্র আলোক দান করেছিল। আপনাদের এ আদরের অসম্মান আমি করব না, নিভবার আগে আমি আমার শেষ শিখাটুকু জ্বালিয়ে যাব। তাতে আপনাদেরে পথের হদিস মিলবে কি না- সকল পথের দিশারী খোদাই জানেন। আমি নিভবার আগে এই সান্ত্বনা নিয়েই নিভব যে, আমি আমার শেষ স্নেহ-বিন্দুটুকু পর্যন্ত জ্বালিয়ে আলো দিয়ে যেতে পেরেছি।

তোমরা আমার সেই প্রিয়তম ছাত্রদল, যাদের দেখলে মনে হয়, আমি যেন কোটিবার কাবা শরিফ জিয়ারত করলাম; যাদের চোখে দেখেছি তৌহিদের রওশনি, যাদের মুখে দেখেছি খালেদ-তারেক-মুসার ছবি, যাদের মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-কলেজকে মনে হয়েছে দর্গার চেয়েও পবিত্র। যাদের বাজুতে দেখেছি আলি হায়দারের বেবেরেগ তেগের শান ও শওকত, কণ্ঠে শুনেছি বেলালের আজানধ্বনি। তোমরা আমার সেই ধ্যানের মহামানবগোষ্ঠী। এ আমার এতটুকু অত্যুক্তি-কল্পনা নয়। তোমাদের আমি দেখেছি তোমাদের অতিক্রম করে সহস্রাধিক বৎসর দূরে-ওহোদের যুদ্ধে বদরের ময়দানে, খয়বরের জঙ্গে। দেখেছি ওমর ফারুকের বিশ্ববিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিকরূপে, দেখেছি দূর আফ্রিকার মুসা-তারিকের দক্ষিণে, দেখেছি মিশরের পিরামিডের পার্শ্বে- পিরামিড ছাড়িয়ে গেছে তোমাদের উন্নত শির। দেখেছি ইরানের বিরান-মুলুক আবাদ করতে, তার আলবোর্জের চূড়া গুঁড়া করে দিতে। দেখেছি জাবলুত তারেকের জিব্রাল্টারের অকুল জলরাশির মধ্যে নাঙ্গা শমশের হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। দেখেছি সেই জলরাশি সাঁতরে পার হয়ে স্পেনের কর্ডোভার বিজয়চিহ্ন অঙ্কিত করতে। দেখেছি ক্রুসেডের রণে, জেহাদের জঙ্গে সুলতানসালাউদ্দিনের সেনাদলের মাঝে- দেখেছি কুরূপা ইউরোপকে সুরূপা করতে। সেদিনও দেখেছি–রিফ-সর্দার আবদুল করিমের সাথে, বিশ্বত্রাস কামালের

পাশে, পহলভির দক্ষিণে, ইবনে সউদের সম্মুকে। যুগে যুগে তোমরা এসেছ ভাবী নেশনের নিশানবরদার হয়ে। তোমরা যে পথ দিয়ে চলে গেছ, মনে হয়েছে– আমি যদি ঐ পথের ধূলি হতাম। আমি প্রাণ-মন পেতে দিয়েছি তোমাদের অভিযানের ঐ পায়ে চলা পথে। আমি যেন তোমাদেরই সেই পায়ে চলা পথের ধূলিসমষ্টি, মূর্তি ধরে এসেছি তোমাদের অতীতকে স্মরণ করিতে দিতে, তোমাদের আর একবার তেমনি করে আমার বুকের উপর দিয়ে চলে যেতে।

কোথায় সে শমশের, কোথায় সে বাজু, সেই দরাজ দস্ত? বাঁধো আমামা, দামামায় আঘাত হানো আর একবার তেমনি করে। যে কওম যে জাতি চলেছে গোরস্থানের পথে, ফেরাও তাকে সেই পথে-যে পথে চলে তারা একদিন পারস্য সাম্রাজ্য রোম সাম্রাজ্য জয় করেছিল, আঁধার বিশ্বে তৌহিদের বাণী শুনিয়েছিল। তোমাদেরই মাঝে থেকে বেরিয়ে আসুক তোমাদের ইমাম-দাঁড়াও তাঁর পতাকাতলে তহরিমা বেঁধে। বলো আল্লাহু আকবর, হাঁকো হায়দারি হাঁক, সপ্ত আসমান চাক হয়ে ঝরে পড়ুক খোদর রহমত, নবির দোওয়া। চাঁদ সেতারা গলে পড়ুক কল্যাণের পাগল-ঝোরা।

আর্ত- পীড়িত কোটি কোটি মজলুম ফরিয়াদ করছে- কে করবে এদের ত্রাণ? তোমাদের চর্বি জ্বালিয়ে জ্বালাও আবার দ্বীনের চেরাগ, এই অন্ধ পথহারা জাতিকে আলো দেখাও? তোমাদের অস্থি-পঞ্জর দিয়ে গড়ে তোল পুলসেরাত-সেই পুলের উপর দিয়ে জয়যাত্রা করুক নতুন জাতি। তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের জ্ঞান অর্জন, যদি নওকরির জন্য, দস্তখত লিখার কায়দা-কানুন শেখার জন্য যদি তোমরা তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জন করো এ জ্ঞানার্জন শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নামে যাক তোমাদের এই শিক্ষাপদ্ধতি,এই শিক্ষালয়।

তোমাদের শিক্ষায়তন- তা স্কুলই হোক, আর কলেজই হোক, আর মাদ্রাসাই হোক পিরের দর্গার চেয়েও পবিত্র, মসজিদের মতোই পাক। এর অঙ্গনে যে দীক্ষা গ্রহণ কর, যে নিয়ত কর, জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয় তবে কাজ কি এই জীবনের এক-তৃতীয়াংশ বাজে খরচ করে?

জরাগ্রস্থ পুরাতন পৃথিবী চেয়ে থাকে যুগে যুগে তোমাদের-এই কিশোরদের-এই তরুণদের মুখের পানে। তোমরা শোনাও তাকে তাজা-ব-তাজার গান, আর তোমাদের সেই প্রাণচঞ্চল সঙ্গীতের জাদুতে সে পাক নব-যৌবনের কান্তিশ্রী! তোমাদের বরণ করে দুলহিনের সাজে সেজে ষড়ঋতুর ডালা শিরে ধরে আজো সে চেয়ে আছে উন্মুখ প্রতীক্ষায় তোমাদের পানে- তোমাদের দক্ষিণ হস্তের দানে তার প্রতীক্ষার শূন্যতা কি পূর্ণ হবে না? কত কাজ তোমাদের-ধরণীর দশদিক ভরে কত ধূলি, কত আবর্জনা, কত পাপ, কত বেদনা- তোমরা ছাড়া কে তার প্রতিকার করবে? কে তার এলাজ করবে? তোমাদের আত্মদানে, তোমাদের আয়ুর বিনিময়ে হবে তার মুক্তি। শত বিধি-নিষেধের, অনাচারের জিঞ্জির বন্দিনী এই পৃথিবী আজাদির আশায় ফরিয়াদ করছে তোমাদের প্রাণের দরবারে,

তার এ আর্জি কি বিফল হবে? এই বাংলার না কি শতকরা পঞ্চান্ন জন মুসলমান। কিন্তু গুনতিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছাড়া এই পঞ্চান্ন জনকে নিয়ে বাঙলার সত্যকার গৌরব করবার কতটুকু আছে, তা হিসাব করতে গেলে মনে হয়-আমরা শতকরা পাঁচজন হলেই এ লজ্জার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। বড় দুঃখে তাই বলেছিলাম,

ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত

গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলেরমত।

এ লজ্জা, এই অপমানের গ্লানি থেকে তোমরা তরুণ ছাত্রদল বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও। সমাজের স্তরে স্তরে, তার গোপনতম কোণেকোণে, বোরকার অন্তরালে, আবরুর মিথ্যা আবরণে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তার নিরাকরণ করো।

ইসলামের প্রথম ঊষার ক্ষণে, সুবহ-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারীশক্তি রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহধর্মিণী নয়, সহকর্মিণী হয়েছিলেন- যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রসুলকে-তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী করে- সকল আনন্দের, সকল খুশির হিসসায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভ-কাজ, কল্যাণ-উৎসব আজ শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দার-তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাঁদের সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা - যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন-পথের দূরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-পেলব। কর্মে পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। সম্মান দেওয়ার নামে এতদিন আমরা আমাদের মাতা-ভগিনী-কন্যা-জায়াদের যে অপমান করেছি আজো তার প্রায়শ্চিত যদি না করি তবে কোনো জন্মেও এ জাতির আর মুক্তি হবে না।

তারও আগে তোমাদের কর্তব্য সম্মিলিত হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। যে ইখাওয়াৎ সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যে একতা ছিল মুসলিমের আদর্শ, যার জোরে মুসলিম জাতি এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী জয় করেছিল, আজ আমাদের সে একতা নেই-হিংসায়, ঈর্ষায়, কলহে, ঐক্যহীন বিচ্ছিন্ন। দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দানখানার সৃষ্টি করেছি; কত তার নাম-সিয়া, সুন্নি, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফি, শাফি, হাম্বলি, মালেকি, লা-মজহাবি, ওহাবি ও আরো কত শত দল। এই শত দলকে একটি বোঁটায়, একটি মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পার তোমরাই। শতধাবিচ্ছিন্ন এই শত দলকে এক সামিল করো, এক জামাত করো-সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে ফেল।

বুলবুল
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪
******

নজরুল ও তাঁর সমাজ চিন্তা

অধ্যাপিকা রোকেয়া পারভীন

কাজী নজরুল ইসলাম দ্যর্থহীনভাবে একটি সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন,তা হচ্ছে মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ। ধর্মের নামে জাতিভেদ আর মিথ্যা সংস্কারকে তিনি জোরালো ভাবে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। উনবিংশ শতকের সংস্কারাচ্ছন্ন ঘুনেধরা সমাজ ব্যবস্থা তাঁকে ব্যথিত করেছে চরমভাবে।

তার লেখায় সুস্পষ্ট ছিল সনাতন কে ভেঙ্গে একটি নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন। সংগত কারণেই কায়েমি স্বাথের ধারক ও বাহকেরা তার প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও নজরুল কিন্তু কাওকে পরোয়া করেন নাই। যা কিছু মানুষের কল্যাণের জন্য নিহিত তিনি তা নির্ভীকচিত্তে উচ্চারণ করে গেছেন-

"তখতে তখতে দুনিয়ায় আজি কমবখতের মেলা/
শক্তিমাতাল দৈত্যেরা সেথা করে মাতলামি খেলা /
ভয় করিও না, হে মানবাত্মা,ভাঙিয়া পড়োনা দুখে/
পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে।"
নিজের জীবনকে বিপন্ন করে মানুষ আর সমাজিক
বিভেদকে দূর করাই ছিলো যেন তার ব্রত।

তিনি ছিলেন যুবসমাজের পথিকৃৎ, তার লেখায় তরুণরা খুঁজে পেতো নবজাগরণের দুর্বার উদ্দীপনা।

হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার ছুৎমার্গ তাঁকে ভীষণভসবে মর্মাহত করেছিলো বলেই বলেছিলেন-" হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি,ভাবছি এতেই জাতির জান/

তাইতো বেকুব,করলি তোরা এক জাতিকে একশ-খান।" সকল মানুষ একই আদমের সন্তান, তাদের মাঝে থাকবে না কোন বিভেদ। কেন তাদের মধ্যে আশরাফ আর আতরাফের পার্থক্য করা হবে! তার প্রদর্শিত পথ ছিলো সাম্যের । যে ধর্ম, মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ঘৃণা করতে শিখায়, সে ধর্ম, ধর্মই নয় এটা ছিলো তার উন্মুক্ত চ্যালেঞ্জ। তিনি বার বার মানুষকে বুঝাতে চেয়েছেন,স্রষ্টা প্রতিটি মানুষের অন্তরে বিরাজ করেন,মানুষের সেবার মাঝেই স্রষ্টাকে খুশি করা সম্ভব ।

তার এই উদারচিন্তার ফলে তৎকালীন রক্ষণশীলদল,

বিশেষ করে ধর্মান্ধ মুসলমানদের দিক থেকে নজরুলের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন দানা বেধে উঠেছিল। তার উদার মনস্ক ভাবনা কে অনেকেই

মেনে নিতে পারছিলেন না। তাদের এই মেনে না নেয়ার পেছনের কারণ ছিল মূলত কূ-সংস্কারচ্ছন্ন

ধর্মবিশ্বাস।

নজরুলের বাণী সমাজ জাগরণের জন্য কতটা সুদূরপ্রসারি ছিলো তা আমরা অনুধাবন করতে পারি তাকে লেখা প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ সাহেবের চিঠি থেকে-"সমাজ মরতে বসেছে ; তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জিবনীসুধা, কে সেই সুধার পাত্র হাতে এনে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে, কোন সুসন্তান আপন তপোবলে গঙ্গা আনয়ন করে এ সগর গোষ্ঠীকে পুনরুজ্জীবন দান করবে, কাঙাল সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতিক্ষায় চেয়ে আছে। কেন জানি না; কিন্তু মনে হয় তোমায় বুঝি খোদা সে সুধা-ভাণ্ডের কিঞ্চিৎ দান করেছেন,

অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে।হাত বাড়াবে কী? একবার সাহসে

বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কী?"

খাঁ সাহেবের এ ইচ্ছা কে নজরুল যথার্থই পূরণ করবার চেষ্টা করে গেছেন, যতদিন তিনি সবাক ছিলেন। কোনোভাবেই যখন তাকে রুদ্ধ করা যাচ্ছিল না, তখনই তার উপর নেমে আসে নির্মম আঘাত! যে আঘাত তাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়।

বাঙালি হয়তো সত্যিই দুর্ভাগাজাতি,তাই বাংলার আকাশে হঠাৎ উদিত ধূমকেতুর আলোর বিচ্ছুরণকে সইতে পারেনি তারা।

অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে আবির্ভাব হয় মহামানবের।

আমার দৃষ্টিতে কাজী নজরুল ইসলাম তেমনি এক ক্ষণজন্মা মহামানব , যিনি সংগ্রাম করে গেছেন অবহেলিত, নিপীড়িত এবং অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য। মানুষকে জাগাতে চেয়েছেন তার আত্মশক্তির

মহিমান্বিত রূপ দর্শনে। ধর্মের অজুহাতে শোষণ করার বেড়াজাল ছিন্ন করে মানুষকে স্বাধীনতার সুফল দিতে চেয়েছেন। তার স্বপ্ন ছিলো একটি স্বাধীন, সংস্কারমুক্ত এবং উদারপন্থী সমাজের, যেখানে থাকবে না কোনো বিভেদ। তাই হয়তো উদাত্তকণ্ঠে বলতে পেরেছেন -"আমি বিদ্রোহ করেছি-বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে , অত্যাচারের বিরুদ্ধে- যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা সেই মিথ্যা- সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে -- এই তো আমার অপরাধ। সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি- নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি এর দরকার ছিলো মনে করেই।"

আত্মশক্তিতে কতটা বলিয়ান হলে এবং সচেতন জীবনদর্শন কতটা মহিমান্বিত হলে একজন মানুষের কণ্ঠে এই মহাসত্য উচ্চারিত হতে পারে, এই ভাবনা সেই মহামানবের প্রতি আমাদের নতজানু করে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা

নিত্য প্রবল হও

****

অন্তরে আর বাহিরে সমান নিত্য প্রবল হও!
যত দুর্দিন ঘিরে আসে, তত অটল হইয়া রও!
যত পরাজয়-ভয় আসে, তত দুর্জয় হয়ে উঠ,
মৃত্যুর ভয়ে শিথিল যেন না হয় তলোয়ার-মুঠো।
সত্যের তরে দৈত্যের সাথে করে যাও সংগ্রাম,
রণক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম।
এই আল্লাহর হুকুম–ধরায় নিত্য প্রবল রবে,
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।
ভালোবাসেন না আল্লা, অবিশ্বাসী ও দুর্বলেরে,
'শেরে খোদা' সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে!
ধৈর্য ও বিশ্বাস হারায়, সে মুসলিম নয় কভু,
বিশ্বে কারেও করে না কো ভয় আল্লাহ যার প্রভু!
নিন্দাবাদের মাঝে 'আল্লাহ-জিন্দাবাদ'-এর ধ্বনি
বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গণি।
আল্লা পরম সত্য, ভয় সে ভ্রান্তির কারসাজি,
প্রচণ্ড হয় তত পৌরুষ, যত দেখে দাগাবাজি!
ভুলে কি গিয়াছ অসম সাহস নির্ভীক আরবির?
পারস্য আর রোমক সম্রাটের কাটিয়াছে শির!
কতজন ছিল সেনা তাহাদের? অস্ত্র কি ছিল হাতে?
তাদের পরম নির্ভর ছিল শুধু এক আল্লাতে!
জয় পরাজয় সমান গণিয়া করেছিল শুধু রণ,
তাদের দাপটে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবীর প্রাঙ্গণ!
তারা দুনিয়ার বাদশাহি করেছিল ভিক্ষুক হয়ে,
তারা পরাজিত হয়নি কখনো ক্ষণিকের পরাজয়ে।
হাসিয়া মরেছে, করেনি কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
ইসলাম মানে বুঝেছিল তারা অসত্য সাথে রণ।
তারা জেনেছিল, দুনিয়ায় তারা আল্লার সৈনিক,
অর্জন করেছিল স্বাধীনতা নেয়নি মাগিয়া ভিখ!
জয়ী হতে হলে মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ হইতে হয়,

শত্রু-সৈন্য দেখে কাঁপে ভয়ে, সে ত সেনাপতি নয়!
শত্রু –সৈন্য যত দেখে তত রণতৃষ্ণা তার বাড়ে,
দাবানল-সম তেজ জ্বলে ওঠে শিরায় শিরায় হাড়ে!
তলোয়ারে তার তত তেজ ফোটে যত সে আঘাত খায়,
তত বধ করে শত্রুর সেনা, রসদ যত ফুরায়।
নিরাশ হয়ো না! নিরাশা ও অদৃষ্টবাদীরা যত
যুদ্ধ না করে হয়ে আছে কেউ আহত ও কেউ হত!
যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা করেছ এক প্রভু আল্লারে,
নত করিও না সে মাথা কখনো কোনো ভয় কোনো মারে!
আল্লার নামে নিবেদিত শির নোয়ায় সাধ্য কার।
আল্লা সে শির বুকে তুলে নেন, কাটে যদি তলোয়ার!
ভীরু মানবেরে প্রবল করিতে চাহেন যে দুনিয়াতে
তারেই ইমাম নেতা বালি আমি, প্রেম মোর তারি সাথে।
আড়ষ্ট নরে বলিষ্ঠ করে যাঁর কথা যাঁর কাজ,
তারি তরে সেনা সংগ্রহ করি, গড়ি তারি শির-তাজ!
গরিবের ঈদ আসিবে বলিয়া যে আত্মা রোজা রাখে,
পরমাত্মার পরমাত্মীয় বলে আমি মানি তাঁকে।
অকল্যাণের দূত যাঁরা, যারা মানুষের দুশমন,
তাদের সঙ্গে যে দুরন্তেরা করিবে ভীষণ রণ-
মোর আল্লার আদেশে তাদেরে ডাক দিই জমায়াতে,
অচেতন ছিল যারা, তারাও আসিছে সে তীর্থ-পথে।
আমি তকবির-ধ্বনি করি মুদু কর্ম-বধির কানে,
সত্যের যারা সৈনিক তারা জমা হবে ময়দানে!
অনাগত 'নবযুগ'– সূর্যের তূর্য বাজায়ে যাই,
মৃত্যু বা কারাগারের আমার কোন ভয় দ্বিধা নাই।
একা 'নবযুগ'–মিনারে দাঁড়ায়ে কাঁদিয়া সকলে ডাকি,
দর্মার হাঁস না আস, আসিবে মুক্ত-পক্ষ পাখি।
এ পথে ভীষণ বাজপাখি আর নিঠুর ব্যাধের ভীতি,
আলোক-পিয়াসী পাখিরা তবুও আসিছে গাহিয়া গীতি।

মৃত্যু - ভয়াক্রান্ত আজিকে বাঙলার নরনারী,
তাদের অভয় দিতেই আমরা ধরিয়াছি তরবারি।
আমরা শুনেছি ভীত আত্মার সকরুণ ফরিয়াদ,
আমরা তাদের রক্ষা করিব, এ যে আল্লার সাধ!
আমরা হুকুমবর্দার তাঁর পাইয়াছি ফরমান,

ভীত নর-নারী তরে অকাতরে দানিব মোদের প্রাণ।
বাজাই বিষাণ উড়াই নিশান ঈশান-কোণের মেঘে,
প্রেম-বৃষ্টি ও বজ্র -প্রহারে আত্মা-উঠিবে জেগে!
রাজনীতি করে তৈরি মোদের কুচকাওয়াজের পথ,
এই পথ দিয়ে আসেবে দেখিও আবার বিজয়-রথ।
প্রবল হওয়ার ইসধ ও সাধনা যাহাদের প্রাণে আছে,
তাদেরি দুয়ারে হানা দিই আমি, আসি তাহাদেরই কাছে।
সঙ্ঘবদ্ধ হতেছে তাহারা বঙ্গভূমির কোলে,
আমি দেখিয়াছি পূর্ণচন্দ্র তাদেরই ঊর্ধ্বে দোলে!

ভয় করিও না, হে মানবাত্মা

তখতে তখতে দুনিয়ায় আজি কমবখতের মেলা,
শক্তি-মাতাল দৈত্যেরা সেথা করে মাতলামি খেলা।
ভয় করিও না, হে মানবাত্মা, ভাঙিয়া পড়ো না দুখে,
পাতালের এই মাতাল রবে না আর পৃথিবীর বুকে।
কথতে তাহার কালি পড়িয়াছে অবিচারে আর পাপে,
তলোয়ারে তার মরিচা ধরেছে নির্যাতিতের শাপে।
ঘন গৈরিকে আকাশ রাঙায়ে বৈশাখী ঝড় আসে,
ভবে লোভান্ধ মানব, তাহার গোধুলি-লগন হাসে!
যে আগুন ছড়ায়েছে এ বিশ্বে, তাহি দাহ ফিরে এসে
ভীম দাবানল-রূপে জ্বালিতেছে তাহাদেরি দেশে দেশে।

সত্য পথের তীর্থ-পথিক! ভয় নাই, নাহি ভয়,
শান্তি যাদের লক্ষ্য, তাদের নাই নাই পরাজয়!
অশান্তি-কামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,
অবশেষে চির-লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে!
পথের ঊর্ধ্বে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জনা
তাই বলে তারা ঊর্ধ্বে উঠেছে-কেহ কভু ভাবিও না!
ঊর্ধ্বে যাদের গতি, তাহাদেরি পথে হয় ওরা বাধা;
পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় না কো কাদা!
জয়ে পরাজয়ে সমান শান্ত রহিব আমরা সবে,
জয়ী যদি হই, এক আল্লার মহিমার জয় হবে!
লাঞ্ছিত হলে বাঞ্ছিত হব পরলোকে আল্লার,
রণভূমে যদি হত হই মোরা হব চির-প্রিয় তাঁর!
হয়তো কখনো জয়ী হবে ওরা, হটিব না মোর তবু,
বুঝিব মোদের পরীক্ষা করে মোদের পরম প্রভু!

বিদ্বেষ লয়ে ডাকিলে কি কভু পথভ্রান্ত ফিরে?
ভালোবাসা দিয়ে তাদেরে ডাকিতে হয় বক্ষের নীড়ে।
সজ্ঞানে যারা করে নিপীড়ন, মানুষের অধিকার
কেড়ে নিতে চায়, তাহাদেরি তরে আল্লার তলোয়ার।
অজ্ঞান যারা ভুল পথে চলে, মারিও না তাহাদেরে,
ভালোবাসা পেলে ভ্রান্ত মানুষ সত্যের পথে ফেরে।
সকল জাতির সকল মানুষে এক তাঁর নামে ডাকো,
বুকে রাখো তাঁর ভক্তি ও প্রেম, হাতে তলোয়ার রাখো।
সর্ববিশ্বে প্রসন্ন হয় তিনি প্রসন্ন হলে,
সত্য পথের সর্বশ্রু ছাই হয়ে যায় জ্বলে!
আমাদেরও মাঝে যার বুকে আছে লুকাইয়া প্রলোভন,
তারেও কঠিন সাজা দিতে হবে, আল্লার প্রয়োজন!

আগে চলো,আগে চলো দুর্জ্জয় নব অভিযান-সেনা,
আমাদের গতি-প্রবাহ কাহারো কোনো বাধা মানিবে না।
বিশ্বাস আর ধৈর্য হউক আমাদের চির-সাথী,
নিত্য জ্বলিবে আমাদের পথে সূর্য চাঁদের বাতি।
ভয় নাহি, নাহি ভয়!
মিথ্যা হইবে ক্ষয়!
সত্য লভিবে জয়!
ভক্তে দেখায় রক্তচক্ষু যারা তারা হবে লয়!
বলো, এ পৃথিবীতে মানুষের, ইহা কাহারো তখত নয়!

পুণ্য তখতে বসিয়া যে করে তখতের অপমান,
রাজার রাজা যে, তাঁর হুকুমেই যায় তার গর্দ্দান!
ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব, ভাই, হয়ে এল ঐ শেষ;
বিশ্বের যিনি সম্রাট তাঁরি হইবে সর্বদেশ!
রক্তচক্ষু রক্ষ যক্ষ, সাবধান! সাবধান!
ভুল বুঝাইয়া, বুঝেছ ভুলাবে আল্লার ফরমান?
এক আল্লারে ভয় করি মোরা, কারেও করি নাভয়,
মোদের পথের দিশারি এক সে সর্বশক্তিময়।
সাক্ষী থাকিবে আকাশ পৃথিবী, রবি শশী গ্রহ তারা,
কাহারা সত্যপথের পথিক, পথভ্রষ্ট কারা!
ভয় নাহি, নাহি ভয়!
মিথ্যা হইবে ক্ষয়!
সত্য লভিবে জয়!

নজরুলকে নিবেদিত কবিতা

মহাবিশ্ব কবি কাজী নজরুল ইসলাম

-মুহাম্মাদ আবদুল আওয়াল

বাংলার আকাশে দীপ্ত অর্ক মহা কবি নজরুল,
সৃষ্টি তোমার ঝর্ণাসম প্রাণে প্রাণে উতরোল।
রুদ্র-তপ্ত বৈশাখ শেষে জন্মিলে মধু মাসে,
দ্রোহ আর প্রেম তাই বুঝি রহে চেতনায়-প্রকাশে?

কৈশোরে ছিলে দুরন্ত এক ঘর ছাড়া পরবাসী,
মায়াবী চোখের স্নেহাতুর মুখ যাদু মাখা ছিলো হাসি।
প্রতীভা দীপ্ত চাহনী আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি- বচন,
আপ্লুত হতো দেখলে তোমায় চেনা অচেনার মন।
হাতে ছিলো বাঁশের বাঁশরি সুর ছিলো মন কাড়া,
বাণী ও সুরের মধুর যাদুতে অন্তর দিতো নাড়া।
স্কুল পালানো দুরন্ত কিশোর সৈনিক অতঃপর,
রনাঙ্গন শেষে ফিরে এলে ছন্দের কারিগর।
'শাত ইল আরব', 'কামাল পাশা', এমনি এক এক করে,
অন্তর ছুঁয়ে লিখে গেলে কাগজের পাতা ভরে।
গদ্য-পদ্য,নাটক নোভেল, কথিকা সম্পাদকীয়,
সংগিতে দিলে প্রাণের ছোঁয়া সুর-সুধা অমিয়।

এক আকাশে 'রবী'-'নজরুল' প্রদীপ্ত একই সাথে,
বিলিয়েছো অমিয় সুধা স্ব-রূপে ধরণীতে।
এক আকাশে দুই-ভাস্কর আলোতে প্রজ্জ্বলিত,
তুমি তোমার মতো করেছো রশ্মি বিচ্ছুরিত।
নদীতে যেমন পাশাপাশি বহে মিষ্টি-লোনা জল,
তেমনি বহেছো আপন সত্তায় দুজন সুনির্মল।
কারো ঢেউয়ে দাপটে ভাঙ্গেনি তোমার গতির বান,
নিজ মহিমায় প্রবল স্রোতেও গড়েছো ব্যবধান।
অগ্রজদের আলোকচ্ছটায় হওনি প্রভাবিত,
আপন সত্তায় কেবলি ছিলে বিদ্যুৎ চমকিত।
অস্ত্র হাতে যুদ্ধে গেলে সাথে নিয়ে এলে গান,
সৃষ্টিতে তোমার ফুটলো কেবলি সুরের কলতান।

গুরুদেবের আশীর্বাদবাণী চাবুকের হাতছানী,
জাগিয়ে দিতে অচেতনদের তড়িৎ চমক হানী।
ভারত বর্ষের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমির স্বাধীনতা,
তুমি প্রথম করলে ঘোষনা ঝেড়ে সব ভিরুতা।
বিশ্ব কাপানো "বিদ্রোহী" তোমার অমর সৃষ্টির নাম,
একাকার আজ "বিদ্রোহী"র সাথে কাজী নজরুল ইসলাম।

সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিতা কাব্যের বিস্ময়,
তুলনা তার 'বিদ্রোহী'শুধু অন্য কিছু আর নয়।
সকল শক্তির প্রতীক তুমি ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টি,
তাল,লয়,ছন্দের যাদুতে অপরূপ সুমিষ্টি।
চেয়েছিলে সমাজের যতো অসম- অনাচার,
কুপমন্ডুকতা, গোড়ামী আর অন্যায় অবিচার,-
দূর হয়ে যাক,বেঁচে থাক্ মানুষ,-নিয়ে নিজ অধিকার;
দুর্বল পাক মুক্তি হতে সবলের অত্যাচার।
মানুষকে তুমি উর্ধ্বে তুলে গেয়েছো জয় গান,
হৃদয় তোমার কেঁদেছে দেখে মানুষের অপমান।
জাত- বেজাতের বিধি-বিধান করেছো অস্বীকার,
বলেছো শুধু মানুষ শ্রেষ্ঠ- আগে তার অধিকার।
মসির নিপুণ আঁচরে তুমি জাগালে ঘুমন্তদের,
নির্ভিক হাতে শিখালে তাদের মন্ত্র স্বদেশ প্রেমের।

অচেতনদের করলে চেতন কথাও সুরের বানে,
মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করলে গানে গানে।
'কবিত্ব' আর 'দেবত্বে'-তুমি পথিকৃৎ বাঙালীর,
তোমার রুদ্র হুংকারে দানব হয়েছিলো অধীর।
তোমার লেখা শক্তি-সাহস প্রেরণা সকলের ,
তোমাতেই পায় বিশ্ব মানব স্বরূপ অস্তিত্বের।
অসীম প্রজ্ঞা,সাহসের এই চরম পরাকাষ্ঠা,
তোমার আগে দেখিনি আর এমন স্বপ্ন দ্রষ্টা।

দারিদ্র্য তোমায় রেখেছিলো করে নিষ্ঠুরতায় বন্দি,
আবার দারিদ্র্যই দিলো শক্তি-সাহস করতে মধুর সন্ধি।
পরকে তুমি আপন করেছো ভুলেছো নিজ ঘর,

সৈনিক তুমি, প্রেমিক তুমি, কবি তুমি যাযাবর।
স্পর্শ তোমায় করেনি কভু জির্ণতা মরমর,
প্রাণ খোলা হাসিতে ছিলে সুদীপ্ত দ্বিপ্রহর।
তোমার লেখায় প্রেম-বিরহের নান্দনিক স্বরূপ,
স্বর্গ সুধায় প্রেমিক হৃদয় রাঙায় অপরূপ।
প্রেমে নহে নর-নারীর বাহ্যিক আস্তরণ,
তোমার প্রেম অস্থিমজ্জার নিবিড় সম্মিলন।

তোমার লেখায় দ্বীন ইসলামের যথার্থ মর্মবাণী,
মোমিন হৃদয় শানিত করেছে আলোকিত ঝলকানি।
এক আল্লাতে পূর্ণ ঈমান রাসূল প্রেমের সুধা,
তোমার সুর ও বাণীর মধুতে মিঠায় প্রাণের ক্ষুধা।

'আনন্দময়ীর আগমন' তুমি করলে আহবান,
করবে যে এসে ধরণী হতে অশান্তির অবসান।
সে আহবানে শাসকরূপী জালিমের অন্তরে,
ঘা-লাগলে,- পাঠায় তোমায় নির্জন কারাগারে।
কারাগারে ও থামেনি তোমার সৃষ্টির বজ্রবান,
প্রতিবাদে অনশন করেও ছিলে তুমি অম্লান ।
তোমার রৌদ্র দ্রোহে কেঁপেছে মসনদ দানবের,
বাঙলী পেয়েছে শক্তি-সাহস দীক্ষা প্রতিবাদের।

হাসির বন্যায় ভাসিয়েছো তুমি ববুকের ব্যথা যতো,
পুত্র শোকে পুড়েছে যদিও অন্তর অবিরত।
অসুস্থ্য প্রেয়সীর আরোগ্যের তরে করেছো সাধ্যের সব।
বুকের অনলে দগ্ধ হয়ে নিভৃতে ছিলে নিরব।
ক্ষুরধার বাণীতে কম্পিত ছিলো দুশমন প্রতিক্ষণ,
সেই প্রেরণায় ধাপে ধাপে হলো স্বাধীনতা উত্তরণ।
বাংলা মায়ের বক্ষ চিরে হলো দ্বি-খণ্ডিত,
তুমি আছো সবার মাঝে- অবিকল অখণ্ডিত।
বাঙ্গালীর আজ বাংলা হয়েছে, বাংলার হয়েছে জয়,
নির্বাক চোখে দেখেছো কেবলি বাঙগালীর বিস্ময়।

শ্বেত- বাদামি চর্মধারীদের শাসন হয়েছে শেষ,

দেখেছো শুধু চেয়ে চেয়ে নিশ্চুপ অনিমেষ।
কোন্ পাষন্ড জানি না কেনো হানলো নিঠুর আঘাত,
মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে রুধিলো সৃষ্টি প্রপাত।
কত কথা বলতে চেয়েও পারনি বলতে মুখে,
বুকের পাজর ভেঙ্গেছে তোমার না বলার করুণ শোকে।

মরনের আগে মরলে তুমি প্রিয় কবি নজরুল,
গাহিলে না আর বঙ্গ বাগানে সুরে গান বুলবুল।
বেঁচে থাকতে ও তোমার কষ্টে বাঙ্গালীর অন্তর,
নীলাভ হয়ে ফেনিয়ে উঠেকছে কেবল নিরন্তর ।
তোমাকে হারিয়ে আমাদের কতো হয়েছে বড় ক্ষতি,
তুমি যে ছিলে পথের দিশারী প্রেরণা, শক্তি ও গতি।

শোকাবহ আগস্ট মাসে নিলে হে চির বিদায়,
যে মাসে শহিদ জাতির জনক নির্মম নিষ্ঠুরতায়।
এই আগস্টে গুরুদেব রবীর হলো মহা প্রয়ান,
আবার এ মাসেই নেতাজী সুভাষ হলেন তিরোধান।
এই অগাস্টে তুমি ও গেলে -আর না ফেরার দেশে,
বাঙালীর চোখের অশ্রুতে নয়- রক্ত স্রোতে ভেসে
আসবে না জানি যদিও বলেছো 'যুগে-যুগে আমিা আসি',
সৃষ্টির মাঝে খুঁজি তোমায়- রেখে যাওিয়া রাশি-রাশি।

মসজিদেরই পাশে শায়িত হলে তুমি অবশেষে,
বাংলার মাটি তোমায় নিয়েছে বুকে টেনে ভালোবেসে!

****

কবি পরিচিতি: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ

নজরুল সমাধি

মুহাম্মাদ এনাম সিকদার

এই তো এই সমাধি মসজিদের পাশে,
এখানে সবুজ চাঁদর বিছিয়ে রেখেছে
ছোট ছোট ঘাসে।
এখানে তুমি বাঙলার গৌরব
চিরনিদ্রায় শায়িত আজ,
হে মোর হৃদয় বাগের বুলবুল কবি
মানসে করো বিরাজ।

তোমার সমাধির পাশে দাড়িয়েছি যখন এক ভক্ত প্রাণ
কণ্ঠে আমার বেজে উঠিল তব প্রার্থনা ভরা সেই গান-
" মসজিদেরি পাশে আমার কবর দিও ভাই,
যেনো গোর হতে মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে-।

তুমি প্রেমপন্থী মরমী কবি মাহাবুব ছিলে খোদার
তাই প্রার্থনা গীত হয়েছে কবুল দরবারে তাহার।

হে মোর আত্তার কবি, আজ কতকথা জাগে মনে
নিখিলের হৃদয় মুগ্ধ করেছ মহাসাম্যের গানে।
যেদিন ব্রিটিশ শোষনে দিশেহারা জাতি নিখিল দেশময়
সেদিন তোমার লিখনীতে হয়েছে বিদ্রোহের রবি উদয়।

নিপিড়িত জনতার তাসবির ভেসেছে
তোমার মানস লোকে
তাই হাতিয়ার লয়ে জঙ্গে লড়েছো,
আবার কখনো লিখে।
তুমি সর্ব হারাদের প্রাণে দিয়ে নতুন মন্ত্রবল
স্তব্ধ হৃদয়ে জাগায়ে ছিলে বিপবের কোলাহল।

আজ ঘুমিয়ে আছো মসজিদের পাশে বাঙলার মুয়াজ্জিন
অশ্রু স্নানে ভিজিতেছি আমরা সর্ব আরেফিন।
তোমার সমাধিতে এসেছি আজ লও মোর সালাম
হে বিদ্রোহী কবি দুখু মিঞা কাজী নজরুল ইসলাম।

আজও স্মরি তোমাকে
আজও চাই তোমাকে

মোসলেম উদ্দিন সাগর

নজরুল তুমি প্রাণের বীণা গানের বুলবুল
প্রিয়ার কাল চুলে তুমি খোঁপায় তারার ফুল।
হাতে রণের তূর্য নিয়ে বাজিয়েছো শ্যামের বাঁশরি,
তুমি বিদ্রোহীর উন্নত শীর, তুমি বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি।
কি নেই তোমাতে?
ধর্ম,কর্ম,মানুষ ও মানব প্রেম
এক জীবনের সব পূর্ণতা!
তোমার সাম্যের গানে মানুষের জয়গান কি মহান এক বিশালতা!
কুলি মজুর থেকে বেশ্যা বেদুইন
সব যে মানুষের জাতি,
বললে সবারে সৃষ্টিকে অপমানে হবে জাতের বজ্জাতি।
রাজবন্দীর জবানবন্দীতেও গেয়েছো সত্য ন্যায়ের গান।
নজরুল মানেই অসাম্প্রদায়িক শ্রেষ্ঠ চেতনার নাম।
দুখু মিয়া থেকে দূরন্ত পথিক
বলেছো চালাও খঞ্জর বুক পেতে,
অত্যাচারীর আরশ কেঁপেছে
তোমার বিষের বাঁশিতে।
চারদিকে আজ জ্বলছে মানুষ, নিঃশ্বাসে নড়ছে পতাকা,
সভ্যতার আকাশে উড়ছে দেখো যত ভন্ড বলাকা।
মুসল্লিরা যায় নিত্য মসজিদে সেজদা দিতে প্রভুকে,
গীর্জা প্যাগডায় জায়গা নেই আর
ডাকছে সবাই ঈশ্বরকে।
সাধুরা যত সাদা ভূতিতে ভক্তিরত মন্দিরে,
মাসুষেরা শুধু কাঁদছে ভয়ে অচেনা বন্দীশিবিরে।
এমন ধরায় খরা পড়ছে মৃত্যু খুব কাছাকাছি,
বৃষ্টির সাথেও এসিড পড়ছে জ্বলছে দেহ অহর্নিশি।
মন তাই এখন বারদ হয়ে জ্বালাতে চায় এ সভ্যতা,
তোমার বীণার ঝংকারে দাও একটু
সাহসী বারতা।

কবির বীণায় বিনা তারের আলাপন

-মোঃ জেহাদ উদ্দিন

সন ১৯৩৯।
অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে বিশ্ব জুড়ে।
যুদ্ধের দামামা বাজছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনের যোদ্ধা তিনি নিজেই।
তিনি বুঝেছিলেন বিদ্রোহ ছাড়া মুক্তি নেই।
যেখানে অনাচার অবিচার অত্যাচার
সেখানে যুদ্ধই তার সমাধান।

তিনি সারাজীবন যুদ্ধ করেছেন, জেল খেটেছেন।
মানুষের মুক্তির গান, সাম্যের গান, সম্প্রীতির গান গেয়েছেন।
তিনি রাহবার হয়ে মানুষকে ডেকেছেন, জাগিয়েছেন।

মানুষের মুক্তির মহাসেনাপতি তিনি
মানুষকে ভালোবেসেছেন অকাতর।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বিলিয়েছেন ভালোবাসার ফুল।

মানুষের কবি তিনি। ১৯৩৯ সালে যখন অন্যায় সমরের মহাদামামা বাজছে
সেই সময় ঢাকা বেতার থেকে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর অমর গান, ভালোবাসার গান-
'আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয়, আমার কথার ফুল গো, আমার গানের মালা গো,
কুড়িয়ে তুমি নিও'।
আবার স্রষ্টার উদ্দেশ্যে মহাজগতে ছড়িয়ে দিলেন অমৃতসুধা:
'তোমার বিনা তারের গীতি বাজে আমার বীণা তারে...'।

কবি এলেন, গাইলেন, জয় করলেন এবং আমাদের হয়েই রইলেন।

আজও সেই বেতার আছে। আর আমি কান পেতে শুনি কবির ভালোবাসার গান, কবির বীণায় বিনা তারের আলাপন।

(ঢাকা বেতার, ২০ আগস্ট ২০১৯)

সাম্যের নজরুল

নাঈম দুর্জয়

আলোকবর্তিকা হাতে যেদিন,পদায়ন করলে ধরায়,,,
রুক্ষ হৃদয় হইলো শীতল,তোমার সাম্যের বন্দনায়...
একটাই তোমার দোষ---
অন্যায়ের সাথে কভু কখনো তুমি,করোনি'ক আপোষ....
জোচ্চোর দালালেরে কখনো তুমি, চাটু নি' ক পা,,,
রূপে নয়,শুধু গুনে সাজাবো, তোমার উপমা...
হে কবি----
সাম্যের গান গেয়ে,
কতো ব্যথা গেলে সয়ে,,
লিখেছি যে কবিতা,আজ তোমায় লয়ে...
মানবের তরে তুমি, বিলিয়েছো প্রাণ,
দিতে পারিনি মোরা তোমার প্রাপ্য সম্মান,
বাঙালি হইয়া এযেনো মোদের চির অপমান...
তোমারি পথের পথিক মোরা, সাম্যের গান গাই,,,,
ছড়াবো তোমার অমর বাণী--"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই"...।

(নাম: নাঈম দুর্জয়।
ঠিকানা: বেড়তলা, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
মোবাইল: ০১৭২০৪৮০২৩১)

ঢাকা ডিএ ৬১০২ বাঙলাকথা ৮ম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা, মে-আগস্ট ২০১৯ মূল্য ১৫০ টাকা